মহাপ্রাচীর

স্বদেশের সাথে প্রবাসের অনন্য সেতু বন্ধন

জানুয়ারি - জুন। ২০২২

বাঘ : চৈনিক বর্ষ ও বাংলার অহংকার

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক :	মোঃ বশীর উদ্দীন খান
নির্বাহী সম্পাদক :	নুজহাত ফারহানা
সহকারী সম্পাদক :	এ বি সিদ্দিক
সম্পাদনা সহকারী :	ইফতে খাইরুল হক ইমন
	ফারজানা নাজনীন শুচি
	সুব্রত কুমার
সার্বিক তত্ত্বাবধানে :	অধ্যাপক ড. মোঃ সাহাবুল হক
	মোহাম্মদ তৌহিদ
	ড. এ. এ. এম. মুজাহিদ
	মারুফ হাসান

সূচীপত্র

০১	বিকেল পাঁচটা- শিরিন আক্তার	৫
০২	বাঘ : চৈনিক বর্ষ ও বাংলার অহংকার	
	ক) চীনা নববর্ষ- গাজি তৌফিক এজাজ	৯
	খ) রয়েল বেঙ্গল টাইগার- এ বি সিদ্দিক	১০
	গ) বাংলার বাঘ: শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক- ইফতে খাইরুল হক ইমন	১২
	ঘ) চীনা বাঘ বছর- ওয়াং হাইমান (ঊর্মি)	১৪
০৩	অপু ভাইয়ের বিড়াল- নুজহাত ফারহানা	১৫
০৪	চীনে কেন পড়তে যাবেন? - ড. মুহম্মদ মফিজুর রহমান	১৭
০৫	সাক্ষাৎকার- ড. কিশোর কুমার বিশ্বাস	২০
০৬	চীনের মহান গার্ডিয়ান সিংহ : ইতিহাস, সাংস্কৃতি এবং পৌরাণিকতা- মারুফ হাসান	২২
০৭	মহামারী ও চীন: বিদেশী শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ও চীনের বর্তমান প্রেক্ষাপট- মোঃ হানিফ আল সাব্বির	২৫
০৮	চীনা বিমান নামকরণ পদ্ধতি ও একটি প্রচলিত কুসংস্কার! - মাইন উদ্দিন	২৭
০৯	চীনের একটি পাহাড়ি পরিবারের গল্প- অজয় কান্তি মন্ডল	২৮
১০	চীনের গবেষণা বান্ধব পড়াশোনা এবং আমার মাস্টার্স এর প্রথম কনফারেন্স পেপার: কিছু কথা- মো সাকিব উল্লাহ সৌরভ	৩২
১১	কবিতা	৩৫
১২	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান- মীর আব্দুর রব	৩৭
১৩	ছয় ঘন্টায় বিশ্ব ভ্রমণ- ফারহানা শুচি	৪২
১৪	শিল্পকর্ম	৪৫
১৫	আলোকচিত্র	৪৯

সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিওয়াইএসএ) দীর্ঘ ছয় বছর ধরে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে চলেছে। ২০১৬ সালে কতিপয় আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বপ্নদ্রষ্টা শিক্ষাবিদের হাত ধরে এই সংগঠনের সুদৃঢ় পথচলার সূচনা হয়। অর্ধযুগের এ বলিষ্ঠ অগ্রযাত্রায় প্রতিষ্ঠানটি আজও গর্বের সাথে এর অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রেখে কাজ করে চলেছে। ২০১৯ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রায় এর মুখপাত্র হিসেবে অনলাইন ম্যাগাজিন, "মহাপ্রাচীর" এবং পরবর্তী সময়ে অনলাইন ভিত্তিক সংবাদ পোর্টাল, 'বিসিওয়াইএসএ নিউজ' এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পথ চলার ক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক যুক্ত করে। ইতিমধ্যে এই প্রকাশনাগুলো আপন মহিমায় পাঠকসমাজ, সুধীজন এবং সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

ম্যাগাজিনটির অন্যান্য সংখ্যার মত এই সপ্তম সংখ্যায়ও আমরা অনেক গুণীজন, প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং সম্ভাবনাময় নবীন লেখকদের লেখা পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি। আশা করছি আগ্রহী পাঠকগণ লেখাগুলো পড়ে উপকৃত হবেন এবং বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা আরও নিবিড়ভাবে অনুধাবন করার সুযোগ পাবেন।

একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সংগঠন পরিচালনা এবং এর প্রকাশনা অব্যাহত রাখা একটি সুকঠিন কাজ। এই কাজটিকে যারা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে এর প্রতিটি অগ্রযাত্রাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই মহৎপ্রাণ ব্যাক্তিদের বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানটির উপদেষ্টামণ্ডলী, পরিচালনা পর্ষদ, সম্পাদনা পর্ষদ এবং লেখকদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি ম্যাগাজিনটির পাঠক, পৃষ্ঠপোষক এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সবার জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও সফলতা কামনা করি।

বিনীত
মোঃ বশীর উদ্দীন খান
সম্পাদক, মহাপ্রাচীর
পিএইচডি শিক্ষার্থী, সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়, সাংহাই, চীন।
সহযোগী অধ্যাপক, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ।

বিকেল পাঁচটা

শিরিন আক্তার

লেকের পাড়ের বেঞ্চে বসে আছে নীলা, একবারে মৃতপ্রায় মানুষের মতো লাগছে তাকে। এই পড়ন্ত বিকেলে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, নারিকেলের পাতা গুলো মাথার উপর তিরতির করে হাওয়ার শব্দ দিচ্ছে। সামনের মাঠে একদল ছেলে ব্যাডমিন্টন খেলছে। অদূরে কয়েক জোড়া কাপল একজন একজনের কাঁধের উপর পরম নিশ্চিতে মাথা রেখে সোহাগী ভঙ্গিতে হাতে হাত রেখে কথা বলে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে, কে কি বলছে, তার কোন খেয়াল নেই। মাঠের এককোনায় এক ছেলে গিটার বাঁজিয়ে গান করছে, তাকে ঘিরে ছেলে-মেয়েরা বসে মন দিয়ে শুনছে।

আসলে নীলা একটা ইউনিভার্সিটির সুন্দর সুশীতল নীল পানির লেকের পাড়ে বসে আছে, সামনে খোলা মাঠ তার ঐ পাশে ছেলেদের আবাসিক হল যেটা সে পরে জানতে পেরেছিল। হাজার হাজার ছেলেমেয়ের আনাগোনা এই পড়ন্ত বিকেলে। এত সুন্দর মনোমুগ্ধকর পরিবেশেও নীলার গাঁ দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে কেন সে বুঝতে পারছে না। হাত-পা গুলো এখনও ঠকঠক করে কাঁপছে। মাথাটা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে। হঠাৎ করে একজনের ডাকে সম্বতি ফিরে পেল। আসলে উনি এক স্কুলের বড় ভাইয়ের মামা। তার সঙ্গে এসেছে। হঠাৎ করে নীলার মনে হল সে আসলে সারাদিন কিছু খায়নি, মামা নামের সেই লোকটাও কিছু খায় নাই।

আসলে গল্পটা এখন থেকে দশ বছর আগের, দিনটা ছিল নীলার নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রথম দিন।এই বার মূল গল্পে আসা যাক। এক গরীব বাবার মেয়ে নীলা, অজপাড়াগাঁয়ে থেকে উঠে আসা। চেহারা বলতে তেমন বলার মত কিছু নাই, যেটা আছে সেটা কারও চোখে পড়ার মত কিছু বলে নীলা মনে করে না। ঐ সে লাভ এ্যাট ফার্স্ট সাইট মানে প্রথম দেখাতেই প্রেম এমন কোন চেহারা আছে বলে নীলার কোন দিন মনে হয়নি। তবে এতকিছুর পরও নীলার একটা নামডাক আছে এলাকাতে, সবাই তাকে এক নামেই চিনে। কারণ নীলার মত মেধাবী ছাত্রী ঐ তল্লাটে সে সময় আর কেউ ছিল না। নীলাকে সবাই খুব ভালবাসতো,কারণ মানুষ হিসাবে নীলা বেশ ভাল মনের অধিকারী।

যাকগে, মূল ঘটনা হল নীলার যে ইউনিভার্সিটি তে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল সেটা বাড়ি থেকে ৫০০ কিঃ মিঃ এর মত দুরে। আসতে নীলার একদিন লেগে যায় প্রায়। নীলার এক বান্ধবী ছিল সে

বলেছিল এই ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে। কিন্তু পরীক্ষার সময় আর সে বান্ধবী আসে নি অনেক দুরে বলে। অগত্য নীলার একা আসতে হয়েছিল। কারণ সে অনেক কষ্ট করে ভর্তির ফরম কিনেছিল টাকা জমিয়ে, বাবা তার পড়ার খরচ ঠিক মত দিতে পারত না। তার উপর তার ছোট আরও দুইটা ভাই বোন আছে। যাদের খরচ ও নীলাকে কম বেশি দেওয়া লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়ার পর সাধারণত মানুষ সবথেকে বেশি খুশি হয় কিন্তু নীলার সুযোগ পাওয়ার পর সবথেকে বেশি অসহায় মনে হয়েছিল। কারণ ভর্তির জন্য নীলার সেই সময় ১০ হাজার টাকার দরকার ছিল। আর সে খুব ভাল করে বুঝে গেছিল বাবা সেটা দিবে না।

টিউশনি করে যেটা পেয়েছিল সেটা দিয়ে তো ভর্তি পরীক্ষাতে বসেছিল। কিন্তু এখন কি করবে নীলা, দশ হাজার! মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থা। বাবাকে বলার সাথে সাথে না করে দিয়েছে। সেদিনের কথা নীলার আজও মনে আছে। নিজেকে পৃথিবীর সব থেকে অসহায় মনে হয়েছিল। যত বড়োলোক বন্ধু বান্ধব ছিল সবার কাছে গিয়ে বলেছিল, "আমাকে একটু সাহায্য কর, আমি পড়তে চাই"। বেশিরভাগ মানুষ কিছুই দেয়নি। অবশেষে তার কলেজের এক স্যার সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে ছয় হাজার টাকা দিয়েছিল। আজীবন মনে থাকবে নীলার...নীলার বাবা নীলার কান্না দেখে সেদিন তাদের শেষ একটু জমি ছিল সেটাও লোকের কাছে বেঁচে দিয়ে টাকা দিয়েছিল। সমস্যা যেটা হয়েছিল, সব টাকা পয়সা যোগাড় করে যখন তৈরী হয়েছিল, তখন অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। নিজের সাথে আসার মত কেউ ছিল না। তাই এই দুঃসম্পর্কের মামার সাথে আসা হয়েছিল। লোকটা বেশ শান্তশিষ্ট, পুরা রাস্তা একটা কোন কথা বলেনি।

বিকেল ৫.০০ টার ভিতরে ভার্সিটিতে পৌছানোর কথা ছিল। রাস্তায় আসতে গেলে দুইটা নদী পড়ে। ফেরী পার হতে অনেক সময় লাগবে। নীলা কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। সময় মত না পৌছাতে পারলে স্বপ্নটা আজ এখানেই শেষ হয়ে যাবে। বাস ছাড়তে ছাড়তে ১১.৩০ বেজে গেল। নীলার মনে উঠলে গাঁ এখনও শিউরে ওঠে। একবার নিজেকে সাহসী ভাবার সাথে সাথে ভীষণ বোকা মনে হয়।

নীলা সারা রাস্তা পাথরের মত বসে ছিল, একটা কথাও বলেনি। অচেনা মানুষটি মনে হয় নীলার মন পড়তে পেরেছিল তাই একটা কথাও বলে নি। শুধু মাঝে মাঝে নীলার অসহায় অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করেছিল খারাপ লাগছে কিনা। নীলা শুধু মাথা নেড়ে বলেছিল, না। যখন প্রথম ফেরীঘাটে পৌছাল সমস্যাটা তখনই বুঝতে পারল নীলা। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, ওদের বাস ফেরীতে উঠবে না। কারণ ফেরী তে জায়গা নেই। বলে রাখা ভাল, সে মাত্র অর্ধেক রাস্তা এসেছে। চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়ল, হাত ঘড়ীটা দেখে নিল, দুপুর ১.৩০ টা! এই ফেরী মিস হলে এক থেকে দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। যা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। পুরা ভাড়া দেওয়া সত্ত্বেও বাস টা কে ছেড়ে দিল। ফেরীতে গিয়ে উঠে অন্য আর একটা বাস ধরল। সিট খালি নেই, লোকে টইটুম্বুর। ঠিকি তো আছে, মাঝ রাস্তায় কি বাসে সিট খালি পাওয়া যায়? নিজের কথা বাদ, মামার জন্য খারাপ লাগছে। বেচারা আমার বিপদ দেখে কোন কথা বলছে না। থাক, ঐ সব এখন আর ভাববার সময় নেই নীলার! কিভাবে বিকেল ৫ টার মধ্যে পৌছানো যায় সেটাই কথা। বাসে একজনকে জিজ্ঞেস করল কতক্ষন লাগবে? লোকটা বলল এখনও দেড় ঘন্টা। নীলা ভাবছে, ঐখান থেকে আরও একটা বাস নিতে হবে। সামনে আরও একটা ফেরী পার হতে হবে, কি আছে কে জানে!

মনে মনে প্ল্যান করছে যদি ফেরী মিস হয়, তাহলে বাস ছেড়ে মোটরসাইকেল এ যাবে। টাকা আছে যথেষ্ট, সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। যখন নীলা বাস স্টেশনে পৌছাল তখন কাটায় কাটায় বিকেল ৩.৩০ বাঁজে। দৌড়ে ভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য অন্য বাসের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। না ধরতে পারল না, বাস ছেড়ে দিয়েছে! টিকিট কাউন্টার এ জিজ্ঞেস করল পরবর্তী বাস কয়টায়? বলল বিকাল ৪.৩০ মিনিট এ। এখানে বলে রাখি, যদি সে সময় মত

বাস পেয়েও যেত তারপরও কমপক্ষে দেড় ঘন্টা সময় তার লাগবে ভার্সিটি তে পৌঁছাতে। ফেরীঘাটের কথা তো বাদ ই দিলাম। লোকটাকে বলল, ভাই আমাকে যে করেই হোক বিকেল ৫.০০টার মধ্যে পৌছাতে হবে। তিনি হেসে বললেন "আফা তাহলে আপনাকে হেলিকপ্টার এ যেতে হবে"। নীলা বলল,"হ্যাঁ দরকার পড়লে তাই যেতে হবে"।এত কষ্ট করে ভর্তির টাকা যোগাড় করে শেষে কিনা নীলা হেরে যাবে তা হতেই পারে না। ওপরওয়ালা নিশ্চয়ই আছেন, ঠিকই একটা ব্যবস্থা করবেন। তারপর সেই সাথে থাকা মামাকে বলল, "মোটর সাইকেল এ যাবো চলেন"। আপনি কথা বলেন, নীলা আসতে আসতে ভেবেই রেখেছিল। গড়বড় হলে মোটরসাইকেল ছাড়া উপায় নেই। মামা, মোটরসাইকেল ওয়ালা কে জিজ্ঞেস করল, "ভাই যাবেন? ভার্সিটি পর্যন্ত ভাড়া কতো?" লোকটা বলল, "৫০০ টাকা"। বাসে ৫০ টাকার ভাড়া লোকটা সুযোগ বুঝে ৫০০ টাকা চায়। নীলা বলল, "সমস্যা নাই, আমার একটা শর্ত আছে, এখন বাজে বিকেল ৩.৪০ মিনিট, ৪.৪০ এর মধ্যে আমাকে ক্যাম্পাসে পৌছে দিতে হবে"। লোকটা বলল, "আমি ফেরী পর্যন্ত যাবো ম্যাডাম, আপনি ঐ পারে গিয়া কিছু একটা নিয়েন"। নীলা তাতেই রাজি হল, অগত্যা নীলার কিচ্ছু করার নাই। আগে তো ফেরী পর্যন্ত যাই। মোটরসাইকেল এ চড়ার পর বুঝতে পারল রাস্তা কত্তটা খারাপ বাংলাদেশের, এক এক ঝাঁকিতে কলিজা মুখে চলে আসছে। অন্য সময় হলে নীলা বলতো আস্তে চালান ভাই, আজ নীলা তা বলতে পারবে না। নীলার এত কষ্ট হচ্ছে কিন্তু চোখে পানি আসছে না। পরানটা মুখের কাছে এসে পড়েছে ক্ষুধায়। আচ্ছা, নীলা কি পৌছাতে পারবে তার গন্তব্যে সময়মত! বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে। নাকি স্বপ্নের ভার্সিটি পড়াটা স্বপ্নই থেকে যাবে।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে যখন ফেরীঘাটে পৌছাল তখন আল্লাহর অশেষ রহমতে ফেরী ঘাটেই ছিল। ড্রাইভার বলল, "আফা আমি যাইবো, আপনি চিন্তা করেন না ফেরী পেয়ে গেছি"। নীলা কিচ্ছু বলল না, শুধু মাথা নাড়ল। ঘড়ির দিকে তাকাল বিকেল ৪.৩০ মিনিট। মাত্র আধা ঘন্টা আছে ভার্সিটি বন্ধ হতে। আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপায় নাই বাঁচানোর। সবাই বলছে ফেরী পার হলে ১০ মিনিট এর রাস্তা। যাকগে, শেষমেশ যখন ক্যাম্পাস এ পৌছাল ১০ মিনিট হাতে ছিল। মামাকে বলল, "ভাড়াটা আপনি দিয়ে দিন, আমি আগে দেখি ভর্তি কোথায় হচ্ছে"। এত বড় ইউনিভার্সিটি তে কত কত বিল্ডিং, কোথায় কাগজ পত্র জমা নিচ্ছে কে জানে! একজোড়া কাপল যাচ্ছিল হাতে হাত ধরে, বিকেলের নরম আলোয় হাঁটতে হাঁটতে। নীলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, ছেলেটা বলল, "তাতো জানি না, তবে মনে হয় প্রশাসনিক ভবনে দেখতে পারেন"। পাশে অদুরে সাদা পোশাক পরা মাথায় হ্যাট পরা একটা ছেলে কে দেখল, নীলা ভাবল পুলিশ মনে হয়। দৌড়ে গিয়ে বলল "ভাইয়া আমাকে একটু সাহায্য করুন না প্লিজ, আমি ভর্তি হতে এসেছি"। ছেলেটা বলল "আপু সময় তো নাই"। নীলা বলল "না ভাইয়া এখনও ১০ মিনিট আছে"।

ছেলেটা বোধহয় বুঝতে পারল যে, নীলা বিপদে পড়েছে। বলল, "জলদি আসুন আমার সাথে। নীলা পিছে পিছে যেতে লাগল। দোতলায় একটা রুমের সামনে বড় একটা ক্রস গেইট, ভেতরে গিয়ে ছেলেটা বলল," মামা, এই মেয়েটা ভর্তি হতে এসেছে। এখন কি আর সময় আছে"? নীলা বলল, "হ্যাঁ, এখনও পাঁচ মিনিট আছে"। বারান্দার লোকগুলা সাথে সাথে বলল "আসো আসো তাড়াতাড়ি আসো"। সাথে সাথে ভেতর থেকে একটা গমগমে আওয়াজ এল,"রহিম মিয়া গেইট বন্ধো করো সময় শেষ"। সাথে সাথে বিশাল গেইট টা আটকে গেল, আমি ঐ দিনের শেষ শিক্ষার্থী ছিলাম। আমি হন্তদন্ত হয়ে ফরম টা পূরন করলাম। মামারা বললেন, "সিরিয়াল নাম্বার টা ঠিকভাবে লিখেন"। হ্যাঁ, এই সিরিয়াল নাম্বার টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক যেমন, কোন চাকরি তে নিজের সিরিয়াল নাম্বার টা দেখতে পাওয়া, কোন ভাল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের সিরিয়াল টা খুঁজে পাওয়াটাও ভাগ্যের ব্যাপার। এই পাঁচটা মিনিট আমার পুরা জীবনটা বদলে দিল। যখন ডিন স্যারের রুমে ঢুকলাম, আমার হাত পা ঠক ঠক করে কাঁপছে। স্যার খুব মিহি করে শান্ত গলায় বললেন,"চিন্তা করো

না, তুমি ইন টাইম এ পৌছে গেছো, তোমার ভর্তি নিবো আমরা"। শরীরটা রাগে রি রি করে জ্বলছিল, একটা মানুষ এত শান্তভাবে কি করে কথা বলে। আসলে তখন এত কষ্ট হচ্ছিল, কোন কথাই ভাল লাগছিল না নীলার। সব কাজ শেষ করে নীলা যখন লেকের পাড়ে এসে বসেছে তখন মাগরিব এর আযান হচ্ছে। বসে বসে ভাবছে আমি এখন পাবলিক ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। এই ভার্সিটি টা আমার আজ থেকে। হঠাৎ মামার ডাকে সম্মতি ফিরে পেল। বলল, "আমি রাতে কই থাকবো"? আসলে নীলা এত কিছুর মধ্যে ভুলেই গেছিল, মামাকে কোথায় রাখবে। মামাকে বলল, "এটা ইউনিভার্সিটি, তার ওপর ভর্তির সময়। যে কাউকে বললেই হবে, তুমি একজন শিক্ষার্থীর গার্ডিয়ান, থাকার জায়গা নাই। তোমাকে তার রুমে থাকতে দিবে"। সামনে দিয়ে এক বড় ভাই যাচ্ছিল, মামা তাকেই বলল। সাথে সাথে কাজ হয়ে গেল। ভাইয়া টা বলল, "আমার রুমে যান, আমার নাম বললেই হবে"।

মামাকে ৫০০ টাকা দিলাম। মামা চলে গেল। আমি আমার এক পরিচিত আপুর রুমে গিয়ে উঠলাম। রাতে শুয়ে আছি ঘুম আসছে না। সবাই আলো জ্বালিয়ে পড়ছে, মিডটার্ম পরীক্ষা চলছে। ভার্সিটি গুলোতে সারা বছর পড়ার কোন খোঁজ থাকে না, ফলে পরীক্ষার আগের দিন খাওয়া ঘুম থাকে না।

নীলার শরীরটা কেমন লাগছে। হঠাৎ মনে হল পুরা শরীর ব্যাথা করছে নীলার। আসলে সারাদিন এত ধকল গেছে, বাইরে বারান্দায় চলে এল। লম্বা হলের বারান্দা।

এ মাথা থেকে ঐ মাথা কিচ্ছু দেখা যায় না। হাঁটতে হাঁটতে শরীরটা কেমন গুলিয়ে উঠল। বাথরুমে গিয়ে দুইবার বমি করে ফেলল। হ্যাঁ, এখন ঠিক লাগছে। আয়নার দিকে তাঁকিয়ে নীলা ভাবছে, এই জায়গাটায় পৌছাতে আমার এত কষ্ট হল! অজান্তেই গড়গড় করে চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। পরদিন সময় মত ভর্তি হয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হল। ডিসেম্বর এর শেষ সপ্তাহ। জানুয়ারির প্রথম তারিখে ক্লাস শুরু হবে। সবকিছু নিয়ে আবার আসতে হবে। হাতে এক সপ্তাহ সময় আছে। বাসে আসতে আসতে আগের দিনের কথা মনে করে মামা কে বলল, "আচ্ছা এতদূর পড়তে এসে কি ভুল করলাম মামা!" লোকটা সেদিন বলেছিল," চান্স পেয়েছো তো তাই বুঝতে পারছো না, ধীরে ধীরে বুঝবা তোমার জীবনের সফলতার কত্তবড় ধাপ এটা"। আজ আর লোকটার সাথে যোগাযোগ নাই নীলার, কোথায় আছে, কেমন আছে, কে জানে! জীবনে উপরের দিকে তাকাতে তাকাতে পিছনে অনেক কিছু ছেড়ে এসেছে। দশ বছর পরও ঐ বিকেলটার কথা নীলা ভুলতে পারে না। জীবনে অনেক বিকেল আসবে যাবে হয়ত, কিন্তু ঐ দিন টা নীলা ভুলতেও চায় না। হঠাৎ ফোনের আলার্ম এ নীলার ঘুম ভাঙল, ফোনে দেখল, বিকেল পাঁচটা! স্বপ্নটার কথা ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, বলল আসরের নামায পড়তে হবে, দেরী করা যাবে না।

লেখিকা :
পিএইচডি শিক্ষার্থী
চাইনিজ একাডেমি অব এগ্রিকালচারাল সাইন্স, হাংজু, জেজিয়াং, চীন।

বাঘ : চৈনিক বর্ষ ও বাংলার অহংকার

চীনা নববর্ষ

গাজি তৌফিক এজাজ

শীতকালীন অয়নের (২১ ডিসেম্বর) পর দ্বিতীয় নতুন চাঁদ ওঠার মধ্য দিয়ে চান্দ্র নববর্ষ উদযাপন শুরু হয়। ২১ জানুয়ারি থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যেকোনো একটি তারিখে এ নববর্ষ হতে পারে। চন্দ্র নববর্ষের এ উৎসব বসন্তকালীন উৎসব নামেও পরিচিত যা দেশটির সবচেয়ে বড়ো উৎসব।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৪ শতকে চীনা নববর্ষ উদযাপনের এই ধারাটি চলে আসছে। তখন শাং রাজবংশ চীন শাসন করত। চন্দ্র নববর্ষের উৎপত্তি নিয়ে অনেক মত প্রচলিত রয়েছে। একটি মত অনুযায়ী বলা হয়, নিয়ান (বছর) নামের এক দানব প্রতিবছরের শুরুতে গ্রামবাসীর ওপর আক্রমণ চালাতো। তবে হট্টগোল, উজ্জ্বল রঙের আলো এবং লাল রং ভয় পেত নিয়ান। আর মানুষ এগুলোকে ব্যবহার করে নিয়ানকে তাড়াতো। তখন থেকে চীনে ড্রাগনকে শক্তি আর সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। আর এজন্যই নববর্ষ উদযাপনের সময় চীনের রাস্তায় রাস্তায় ড্রাগনের মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা এবং আতশবাজির ঝলকানি হইহুল্লর করা হয়ে থাকে। পুরোনো বছরের দুর্ভাগ্যগুলো মুছে ফেলতে নববর্ষে লোকজন তাঁদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার করেন।

চীনা সংস্কৃতিতে ইদুর, গরু, বাঘ এবং খরগোশসহ ১২টি পশু দিয়ে চীনা বর্ষ চিহ্নিত হয়। প্রতিবছর চীনা রাশিচক্রের ১২টি পশু থেকে ১টির নামে নতুন বছরের নাম দেওয়া হয়ে থাকে এবং এভাবেই চলতে থাকে। এ বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে চীনারা চন্দ্র পঞ্জিকা অনুযায়ী বাঘ বর্ষে পদার্পন করেছে। প্রাচীনকালে বাঘকে সবাই সম্মান করতো বলে মনে করা হয়ে থাকে। চীনা রাশিচক্রে বাঘ হচ্ছে শক্তির প্রতীক। পাশাপাশি বাঘ শুভ এবং সহিষ্ণুতারও প্রতীক। বলা হয়ে থাকে, এই নতুন বছরে যত শিশু জন্ম নেবে—তারা বাঘের ন্যায় সাহসী, ক্ষীপ্র ও শক্তিশালী হবে।

বাঘ চীনের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিতে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সবাই বাঘের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং তাকে পাহাড়ের রাজা বলে মনে করে। সুতরাং, বাঘ হলো ক্ষমতার প্রতীক। এছাড়া, বাঘ সাহস এবং সুখেরও প্রতীক। এ সম্পর্কে চীনের রীতি-নীতি ক্ষেত্রের একজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ চাও সু বলেন, 'প্রাচীনকালে চীন একটি খুবই সমৃদ্ধ দেশ ছিল। সে সময় বাঘ ছিল চীনা জাতির একটি কল্যাণমুখী প্রানী। এমনকি, কেউ কেউ বাঘকে একজন রক্ষী দেবতা মনে করতো। 'উত্তর পূর্ব বাঘ' এবং 'হুয়াং নান বাঘ' সবার মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সুতরাং, বাঘের কদর খুবই বেশি।

চীনের জাতীয় এ উৎসবের আনন্দ ভাগভাগি করতে লাখ লাখ চীনা নাগরিক বিভিন্ন শহরগুলো থেকে যার যার বাড়ির পানে, নাড়ীর টানে ছুটে। উৎসব উপলক্ষে এক সপ্তাহের সরকারি ছুটিতে চীনাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের এক অমোঘ সুযোগ মেলে সবার। চীনে পরিবারের সঙ্গে নববর্ষ উদযাপনের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে লাখো মানুষ চীনে জড়ো হন। এর জন্য কেউ কেউ হাজারো মাইলও পাড়ি দিয়ে থাকেন। উৎসবকে ঘিরে একসঙ্গে এত বেশি মানুষের বিচরণ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বলে বিবেচিত। সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে লাল রঙে সাজানো হয় চীনের প্রতিটি বাড়িঘর। শিশুদেরও টাকা উপহার হিসাবে দেওয়া হয় উজ্জ্বল লাল রঙের খামে ভরে। লণ্ঠন উৎসবের মধ্য দিয়ে চান্দ্র নববর্ষ উদযাপন শেষ হয়। পূর্ণ চাঁদকে স্বাগত জানাতে লণ্ঠন উৎসব করা হয়ে থাকে।

লেখক :
পিএইচডি শিক্ষার্থী,
হোহাই ইউনিভার্সিটি, নানজিং, জিয়াংসু, চীন।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

এ বি সিদ্দিক

রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে ও ভারতের দক্ষিণ পূর্ব ভূখণ্ডে অবস্থিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনে যে সকল সুদর্শন বাঘ দেখা যায় তা বিশ্বব্যাপী রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত। পশু বিজ্ঞানীদের কাছে এরা Panthera tigris tigris বা Panthera tigris bengalensis নামে পরিচিত। ভারতীয় উপমহাদেশে যত বাঘ দেখতে পাওয়া যায়—রয়েল বেঙ্গল টাইগার সবার মধ্যে আকারে বৃহৎ। ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন এবং হিংস্রতায় অনন্য এই বাঘ পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। তবে দক্ষিণ এশিয়ার নেপাল, ভুটান, মায়ানমার ও দক্ষিণ তিব্বতে এই প্রজাতির কিছু বাঘের দেখা মেলে। গোটা বিশ্বের বাঘ পরিবারের সিংহভাগ সদস্য ভারতীয় উপমহাদেশের এই বেঙ্গল টাইগার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। বেঙ্গল টাইগার এই অনন্য ঐতিহ্যিক কারণে বাঘ উপমহাদেশীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাই, বাঘ বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় প্রাণীর সম্মাননা পেয়েছে। এছাড়াও 'অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট' চ্যানেলের সমীক্ষা অনুযায়ী— বাঘ বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রাণী।

বাঘ (Panthera tigris) বিড়াল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। প্যানথেরা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত চারটি বৃহৎ বিড়ালের মধ্যে এটি একটি। বর্তমানে পুরো বিশ্বে ৩০০০-এর মতো বাঘ আছে, যার প্রায় অর্ধেক বেঙ্গল টাইগার। সাইবেরীয় বাঘের পর বেঙ্গল টাইগার বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপপ্রজাতি। সাইবেরীয়ান বাঘগুলো সাধারণত আকারে প্রায় ১০.৭৫ ফুট (৩.৩ মিটার) লম্বা ও ওজনে প্রায় ৩০০ কেজির মত হয়ে থাকে। আর বেঙ্গল টাইগারগুলো আকারে হয় প্রায় ৭-৯ ফুট লম্বা ও ওজনে প্রায় ১৫০-২২৭ কেজি। দেহের দৈর্ঘ্য একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার প্রায় নয় ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় বন্য পরিবেশে একটি বাঘ সাধারণত ৮ থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে। তবে বর্তমানে বিভিন্ন বাঘ জাতির ওজনের উপর পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, গড়ে বেঙ্গল টাইগারেরা সাইবেরিয়ান বাঘের চেয়ে বড়ো।

মোটা মোটা পা, মজবুত দাঁত ও চোয়াল এবং সমস্ত দেহ জুড়ে ডোরাকাটা রঙের বাহারি নকশাখচিত রয়েল বেঙ্গল টাইগার একটি স্তন্যপায়ী মাংসাশী প্রাণী। এদের গায়ের রঙ হলুদ থেকে হালকা কমলা রঙের হয়। ডোরার রঙ হয় গাঢ় ক্ষয়েরি থেকে কালো। পেটটি হচ্ছে সাদা এবং লেজ কালো কালো আংটিযুক্ত সাদা। এই হলদে ডোরাকাটা রং বেঙ্গল টাইগারকে অন্যসব প্রজাতির বাঘ থেকে করেছে আলাদা ও অনন্য। জেনেটিক মিউটেশনের কারণে বেঙ্গল টাইগারের এক বিশেষ এবং দুর্লভ জাত হোয়াইট বেঙ্গলের দেখা মেলে, যাদের গায়ের রঙ সাদা হয়। রয়েল বেঙ্গলের চোখের রঙ হলদে হলেও হোয়াইট বেঙ্গলের রঙ হয় নীলচে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পৃথিবীর প্রতিটি বেঙ্গল টাইগারের গায়ের ডোরাকাটা দাগের ধরন একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ, দুটো বাঘের ডোরাকাটা দাগ সাধারণত কখনই এক হবে না। অনেকটা মানুষের চেহারা বা আঙুলের ছাপের ন্যায়।

বাঘ একটি অসাধারণ শিকারি। তবে, সাধারণত ১৮ মাস বয়সের আগে বাঘ শিকার করতে পারে না। এরা নিশাচর এবং খুবই শক্তিশালী হিংস্রপ্রানী। এদের গর্জন প্রায় ৩ কিলোমিটার দূর হতেও শুনতে পাওয়া যায়। বাঘ সাধারণত ছদ্মবেশে শিকার করে থাকে। ছদ্মবেশ ধারণের জন্য এদের চামড়ার রং এবং গঠন যথেষ্ট সহায়ক। শিকারের সময় খুব সাবধানে এবং নিঃশব্দে স্প্রিংয়ের ন্যায় লাফ দিয়ে শিকারের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে শিকার করে থাকে। এদের দাঁত খুব শক্ত হয়। আকারে প্রায় ১০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের এই দাঁতের কামড় থেকে শিকার সহজে বের হতে পারে না। মোট কথা, এরা শিকারকে কোনো সুযোগই দেয় না। বাঘ মাইলের পর মাইল শিকারের জন্য বিচরণ করতে পারে। বনের হরিণ এবং বন্য শুয়োরই এদের প্রধান শিকার। একটি ক্ষুধার্ত বাঘ প্রায় ৬০ পাউন্ড (২৭ কেজি) মাংস সাবাড় করে দিতে পারে। যদিও বাঘ একবারে নয় বরং অল্প অল্প আহার করতে পছন্দ করে।

বাঘের আরেকটি মজার বিষয় হলো- খুব কম সংখ্যক বাঘই মানুষখেকো হয়ে থাকে। একটি বাঘ তখনই মানুষখেকো হয়, যখন সেটি অসুস্থ হয়ে যায় এবং শিকার করার আর শক্তি অবশিষ্ট না থাকে। যখন শিকার একেবারেই খুজে না পায়, তখনই বাঘ খাবারের জন্য গ্রামে ঢুকে পরে এবং মানুষকে আক্রমণ করে থাকে। তবে বাঘ মানুষকে এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করে।

দেশের জাতীয় পশু হিসেবে পরিচিত এই বাঘকে বাংলার গৌরব এবং তেজোদীপ্ততার প্রতীক হিসেবেও দেখা হয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি, সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা নানান কারণে প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে। কয়েক দশক আগেও (পরিপ্রেক্ষিত ২০১০), বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণ ছিল। পঞ্চাশের দশকেও বর্তমান মধুপুর এবং ঢাকার গাজীপুর এলাকায় এই বাঘ দেখা যেত; মধুপুরে সর্বশেষ দেখা গেছে ১৯৬২ এবং গাজীপুরে ১৯৬৬ সালে।

বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশে সারা পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি বাঘের বসবাস। এই সংখ্যা হিসাব করা হয় বাঘের জীবিত দুটি উপপ্রজাতির সংখ্যাসহ। ২০০৪ সালের বাঘশুমারী অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রায় ৪৫০টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে। তবে, বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বর্তমানে এই সংখ্যা ২০০-২৫০টিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিষয়ে অতিদ্রুত কার্যকরী কিছু পদক্ষেপ না নেওয়া হলে, বাঘদের আর রক্ষা করা সম্ভব হবে না। জাতীয় পশুর করুণ এই পরিণতি আমাদের জাতীয় ব্যর্থতায় রূপান্তরিত হবে। প্রকৃতির আশ্চর্য, অনন্য এবং সুন্দরবনের রাজা রয়েল বেঙ্গল টাইগার ফের বাংলার বনে দাপটের সাথে রাজত্ব করুক—সেই প্রত্যাশায় আছে বাংলাদেশ।

লেখক :
মাস্টার্স শিক্ষার্থী,
নানজিং ফরেস্ট্রি ইউনিভার্সিটি, নানজিং, জিয়াংসু, চীন।

বাংলার বাঘ: শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক

ইফতে খাইরুল হক ইমন

বাংলাদেশে হাতেগোনা খুব কম লোকই পাওয়া যাবে যারা শেরে বাংলা (বাংলার বাঘ) নামটির সাথে পরিচিত নয়। বাঘের ন্যায় সাহসী ও সুঠাম দেহী সুপুরুষ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৮৭৩ সালের ২৬ শে অক্টোবর বরিশালের (তৎকালীন বাকেরগঞ্জ, ব্রিটিশ ভারত) ঝালকাঠি জেলা ও রাজাপুর উপজেলার সাতুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম আবুল কাসেম ফজলুল হক। তিনি ছিলেন একাধারে একজন বিখ্যাত বাঙালি রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী ও রাষ্ট্রনায়ক। শেরে বাংলা ব্রিটিশ ভারত এবং পরে পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নেতা ছিলেন।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৯৩ সালে তিনি তিনটি বিষয়ে (গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা) অনার্সসহ প্রথম শ্রেণিতে বি.এ. পাশ করেন। পরবর্তীতে এম.এ. প্রায় দেড়বছর ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যয়ন করলেও, মাত্র ৬ মাস পড়াশোনা করে ১৮৯৫ সালে অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণিতে এম. এ. পাস করেন। তখনকার বরিশালের অচল একটি কলেজের (রাজচন্দ্র কলেজ) অধ্যাপক পদ প্রাপ্তির পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের এফ. এ (বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক সমমান) পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁর ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বেশ দক্ষতা ছিল। এছাড়া তিনি বক্তৃতাদানে ছিলেন বেশ পটু। শেরে বাংলার বজ্র কণ্ঠস্বর ও চিত্তাকর্ষক সাবলীল উপস্থাপন শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো অতি সহজেই।

চাকুরির পাশাপাশি ১৮৯৭ সালে তিনি বি. এল. পাশ করেন এবং স্যার আশুতোষ মুখার্জির শিক্ষানবিশ হিসেবে আইন জগতে পা রাখেন। এর ঠিক দুবছর পর তিনি নিজেই আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০১ সালে তিনি বরিশালে ফিরে আসেন। ১৯০৩ থেকে ১৯০৪ সালে বরিশাল বার অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব নেয়ার পাশাপাশি বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজের গনিতের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯০৬ সালে ওকালতি ছেড়ে তিনি সরকারি চাকুরিতে পা দেন। ফজলুল হক বেশ কিছুদিন ঢাকা ও ময়মনসিংহে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯১১ সালে সরকারি চাকরিকে বিদায় জানিয়ে তিনি আবারো কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন এবং ওইদিন তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হয়।

পত্রিকা সম্পাদনা: শেরেবাংলা একে ফজলুল হক বরিশালে অধ্যাপনাকালে 'বালক' নামে ছোটদের একটি পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। এর দীর্ঘ বিরতিতে কলকাতা হতে ''নবযুগ'' নামক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক।

শিক্ষানুরাগী: ১৯২৪ সালে দ্বৈত শাসনকালে তিনি শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে কতিপয় স্কুল-কলেজ স্থাপন করে দেশের শিক্ষার পথ সুগম করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ তাদের শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহতা। শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন ফজলুল হক মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য প্রদেশে বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই শিক্ষার বিস্তার করাকে তিনি তাঁর দায়িত্বরূপে বিবেচনা করেছিলেন। এ লক্ষ্য নিয়ে তিনি বঙ্গীয় আইন সভায় প্রাথমিক শিক্ষা বিল পেশ করেন যা প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করে আইন হিসেবে পাস করা হয়েছিল।

কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ, চাখার কলেজ, ওয়াজিদ মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল, রাজশাহীর আদিনা ফজলুল হক কলেজ, লেডী

ব্রাবোর্ন কলেজ, ঢাকার ইডেন কলেজের ছাত্রীনিবাস, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেল, ঢাবির ফজলুল হক হলের প্রতিষ্ঠা তার বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় বহন করে। এছাড়াও কৃষি খাতে উন্নয়নের জন্য ঢাকা, রাজশাহী এবং খুলনায় কৃষি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

শেরে বাংলা উপাধি লাভ: ১৯৪০ সালে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন এবং তা পেশ করেন। পাঞ্জাবের জনগন তাঁর এই বীরত্বব্যঞ্জক বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে 'শের-এ-বাংলা' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। তদবধি এই নামেই তিনি সুপরিচিত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জনসেবা: শেরে বাংলার চরিত্র ছিল বজ্রের ন্যায় কঠোর এবং কুসুমের ন্যায় কোমলতার সংমিশ্রণে গড়া। শেরে বাংলার জীবদ্দশায়ই জাতিধর্ম নির্বিশেষে জনসাধারণ তাঁর উদার ও পরোপকারী স্বভাবের জন্য তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর আইন ব্যবসায়ের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি বিনা ফি-তে নিপীড়িত দরিদ্র মক্কেলের মকদ্দমা করতেন। এমন হয়েছে যে, তাঁকে মকদ্দমার শেষে ধার করে মফস্বল হতে ফিরতে হয়েছে। শেরে বাংলা দরিদ্র ছাত্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। এজন্য তিনি প্রয়োজনবোধে স্বীয় পত্নীর অলংকারও বন্ধক রাখতেন।

তিনি দু'হাত ভরে দান করতেন। গোপন দান ছিল তাঁর দানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কত যে ঋণগ্রস্ত লোক, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা শেরে বাংলার গোপন দানে উপকৃত হয়েছে তার হিসেব নেই। শোনা যায়, দুর্দশাগ্রস্ত ও অতি দরিদ্রদের সাহায্য করতে গিয়ে তিনি নিজেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রীরূপে মহাজন আইন, প্রজাস্বত্ব আইন, কৃষিখাতক আইন প্রভৃতি প্রণয়নে নিপীড়িত জনগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। তৎকালীন মহাজনেরা চড়া সুদে কৃষকদের টাকা ধার দিয়ে তাদের সম্পত্তি নিলামে তুলে সুদের টাকা আদায় করত। মহাজনদের এই অত্যাচার থেকে কৃষকদের বাঁচাতে তিনি প্রত্যেক ইউনিয়নে ঋণ সালিশী বোর্ডে গঠন করেন, যা তৎকালীন বাংলার গরীব প্রজাদের মহাজনী সুদের হাত থেকে নিস্তার দেয়।

বাংলার ডোবা-নালাগুলো একসময় ছিল কচুরিপানায় ভর্তি। তিনি কচুরিপানার যথাযথ ব্যবহার চালু করেন। এর অংশ হিসেবে পঁচানো কচুরিপানা সার হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। এছাড়া ভূমিহীন কৃষকেরা কচুরিপানা জমিয়ে ভাসমান কৃষিজমি তৈরি করা শুরু করে দিলেন। তাঁর নেয়া এই পদক্ষেপ আসলেই সুফল বয়ে এনেছিল বাংলায়। কচুরিপানা সার হিসেবে ব্যবহারের ফলে একদিকে কৃষিখাতে উন্নতির পাশাপাশি ডোবাগুলো জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়েছিল।

শেরে-বাংলার তাঁর জীবনে এরকম আরো বহুবিধ কাজ করে গেছেন যে খবর এমনকি ইতিহাসের কাছেও নেই।

সম্মাননা: শেরে বাংলা ক্রিকেট খেলতে খুব ভালোবাসতেন। বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট মাঠ শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম যা বাংলাদেশের হোম অব ক্রিকেট হিসেবে খ্যাত, তাঁর নামে নামকৃত। তাঁর নামে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সহ বরিশালে একটি সরকারি মেডিকেল কলেজের রয়েছে। এছাড়াও তাঁর নামে অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের নামকরণ করা হয়েছে।

শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক বাংলার মানুষের স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বাংলার মানুষের প্রতি অসীম ভালোবাসা ও এদেশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতিকল্পে তাঁর অবদান কখনো ভুলবার নয়। বাঙালী জাতি সর্বদা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে বাংলার বাঘ নামে পরিচিত এ.কে. ফজলুল হক নামটি।

লেখক :
মাস্টার্স শিক্ষার্থী,
সাংহাই ইউনিভার্সিটি, সাংহাই, চীন।

চীনা বাঘ বছর

ওয়াং হাইমান (ঊর্মি)

চীনা চন্দ্র নববর্ষের তারিখ প্রতি বছর আলাদা হয় এবং এটি একটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তা হল—চাঁদের চক্র। চন্দ্রবর্ষ বারোটি রাশিচক্রের প্রাণীদের সাথে যুক্ত, যাদের প্রতিটিরই নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই প্রাণীগুলো হলো— ইঁদুর, ষাঁড়, বাঘ, খরগোশ, ড্রাগন, সাপ, ঘোড়া, ছাগল, বানর, মোরগ, কুকুর এবং শূকর।

বারো বছরের চক্রের ওপর ভিত্তি করে প্রাণীদের ভাগ করা হয়। এভাবেই ২০২২ সাল নির্বাচিত হয়েছে বাঘের বছর হিসেবে। বাঘ সমস্ত প্রাণীর রাজা হিসেবে পরিচিত এবং চীনা রাশিচক্রে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। গত বছর, অর্থাৎ, ২০২১ ছিল ষাঁড়ের বছর।

নিম্নলিখিত বছরগুলোয় জন্মগ্রহণ করলে আপনি বাঘের চিহ্নপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবেন; ১৯০২, ১৯১৪, ১৯২৬, ১৯৩৮, ১৯৫০, ১৯৬২, ১৯৭৪, ১৯৮৬, ১৯৯৮, ২০১০ এবং ২০২২। বাঘের বছরে যারা জন্মগ্রহণ করে, তারা খুব সাহসী, দৃঢ় এবং নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্নসহ বাঘের আরও কিছু গুণাবলীর অধিকারী বলে মনে করা হয়ে থাকে।

চীনা রাশিচক্রগুলো স্বর্গীয় কান্ড এবং শাখা ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা পাঁচটি উপাদানের মধ্যে একটির (ধাতু, জল, কাঠ, আগুন এবং পৃথিবী) প্রতিটি বাঘ বছর একটি ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে সমন্বয় করে হয়ে থাকে। এর মানে প্রতি ৬০ বছরে, একটি উপাদান রাশিচক্রের চিহ্নে প্রযোজ্য হয়ে থাকে এবং এর সাথে কিছু ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য যুক্ত হবে। ২০২২ হল ওয়াটার টাইগারের বছর। সর্বশেষ ওয়াটার টাইগার বছর ছিল ১৯৬২ সালে।

বাঘ পশুদের রাজা। এটি সাহসের প্রতীকও বটে। চৈনিক রাশিচক্রে, বাঘ তৃতীয় স্থানে রয়েছে এবং এটি ঐতিহ্যগতভাবে চীনা সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ঠিক যেমন বাংলাদেশের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। চীনা বাঘবর্ষে, চীনা বন্ধুরা তাদের আত্মীয় এবং বন্ধুদের 'বাঘের শক্তি বহন করে' বাক্যটি ব্যবহার করে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানাতে পছন্দ করে। 'বাঘ' শুধুমাত্র সাহসী নয়— একটি শুভ অর্থও প্রকাশ করে। এটি ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক। সাথে সাথে এটি ন্যায়বিচার বজায় রাখার ক্ষমতাকেও প্রতিনিধিত্ব করে।

লেখিকা :
সাংবাদিক, বাংলা বিভাগ
চায়না মিডিয়া গ্রুপ, বেইজিং, চীন।

অপু ভাইয়ের বিড়াল

নুজহাত ফারহানা

আমাদের অপু ভাইয়ের বিড়ালটা কথা বলতে পারত। নরম নরম, ভোটকামত সোনালি বিড়ালটাকে জাবড়ে ধরে আদর করতে নিলেই সে, "সর তো, আমার গরম লাগছে!" বলে হেলেদুলে সরে যেত। বেশিরভাগ সময় খাটের নিচে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকত। কপাল বটে শালার! বাটি ভরে মুরগির কলিজা-গিলা দিয়ে মাখানো ভাত সাবাড় করে সারাদিনই শুয়ে থাকত। মন চাইলে কোলে এসে ঘষাঘষি। আদরের তার কোন কমতি ছিল না! এসি রুম ছাড়াতো রাখাই যেত না!

প্রথম যেদিন আবিষ্কার করলাম যে ব্যাটা কথা বলতে জানে, আমিতো সারা পাড়ায় ঢোল দিয়ে দিলাম! রাত নেই, দিন নেই কেবল এ পাড়া, ও পাড়া থেকে মানুষ আসতো কথা-বলা বিড়াল দেখতে। অপু ভাই সেবার আচ্ছা প্যাঁদানি দিয়েছিল আমাকে! কানে ধরে মুচড়ে দিয়ে বলেছিল, "বিড়াল এনেছি মানুষ দেখব না বলে, আর তুই দাওয়াত করে মানুষ নিয়ে আসছিস? আর যদি দেখেছি...." না, বাবা! অমন কানমুলো খাওয়ার আর ইচ্ছে নেই। ঢের হয়েছে! এর পর পরই অপু ভাই বাসা বদলে চলে এলেন একটু দূরে। মানুষের ভীড় থামানো কষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

হ্যাঁ, উনি বিয়ে করেননি। মানুষ পছন্দ করেন না তিনি একদম। মানুষের চেয়ে পশুপাখিই তার কাছে বেশি প্রিয়! নিজের বাসা ছেড়ে যাবার সময় কী মনে করে উনি আমাকে সাথে নিয়ে গেছিলেন। মাকে বলে গিয়েছিলেন, "খালা, একে নিয়ে গেলাম। স্কুলে ভর্তি

করে দেব। চিন্তা কর না, দেখবা একদিন অনেক বড় হইসে!" মা-ও নিষেধ করেননি। অভাবে পড়ে কাজ করতেন অপু ভাইদের বাসায়। তার সন্তানকে কেউ স্কুলে ভর্তি করে দেবে, এ তো সুখের কথা! সেই থেকে আমি অপু ভাইয়ের সাথেই থাকি। আমাকে অনেক আদরে রেখেছেন। মাঝে মাঝে মায়ের সাথে দেখা করি। আমার বাড়ির চেয়ে অপুর ভাইয়ের বাসায় থাকতেই বেশি ভাল লাগে। মানুষটা পাগল, কিন্তু খুব ভাল!

বিড়াল শালা ইদানিং বেশ জ্বালায়। বলে কিনা পারসিয়ান ক্যাটের বংশ নাকি খানদানি বংশ! স্কুলে ভর্তি করে না দিলে নাকি তার আর মান-সম্মান থাকে না। অপু ভাই পড়লেন মহা বিপদে। স্কুলে ভর্তি করানো নিয়ে তার আপত্তি ছিল না, তবে বিড়ালের স্কুল কোথায় আছে! অনেক খুঁজে পেতে এক মেয়েকে পাওয়া গেল, সে কিন্ডারগার্টেনে পড়ায়। তার স্কুলে বিড়াল ভর্তি করানো না গেলেও সাথে করে নিয়ে ক্লাসে বসিয়ে রাখাতে তার কোন আপত্তি নেই। যেই কথা, সেই কাজ! বিড়ালের স্কুল ইউনিফর্ম বানানো হল। বইখাতা আর ব্যাগ গুছিয়ে তাকে ম্যাডামের সাথে স্কুলেও পাঠানো হল। বিড়াল ব্যাটা দিনে দিনে পণ্ডিত হয়ে উঠল। পরীক্ষায় পাচ্ছেও হায়েস্ট! ভাবের জ্বালায় তাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে নাহ! ইদানিং অপু ভাইয়ের মুখে মুখে তর্কও করছে আবার আমার ইংরেজি বানানের ভুল ধরে বেড়াচ্ছে!

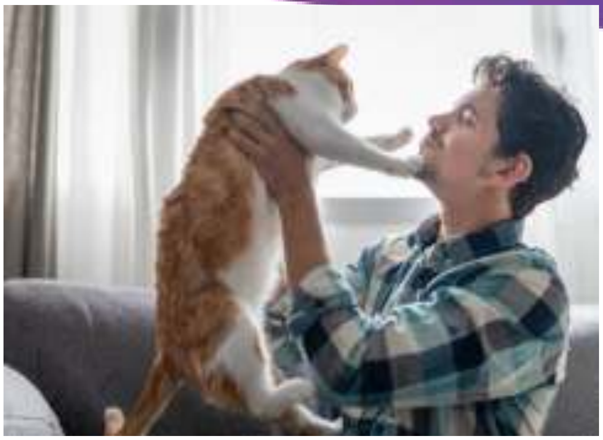

একদিন অপু ভাইয়ের ধমক খেয়ে মুখ ভোঁতা করে স্কুলে গেল। কিন্তু স্কুল থেকে আর ফিরে এল না! এখানে, ওখানে অনেক খুঁজলাম। পাওয়া গেল না।

আমি এখন অপু ভাইকে মুরগির গিলা-কলিজা মাখানো ভাত খাওয়াই। উনি খেয়ে-দেয়ে স্কুল ইউনিফর্ম পরে এসি ছেড়ে খাটের নিচে গিয়ে শুয়ে থাকেন। ধরতে গেলেই বলেন, "গরম লাগছে।" আমি আমার রুমে ফিরে এসে ভুল-ভাল বানানে বিড়াল ব্যাটাকে চিঠি লিখি...

লেখিকা :
শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক চীনা ভাষা শিক্ষা
ইউন্নান বিশ্ববিদ্যালয়, খুনমিং, ইউন্নান

চীনে কেন পড়তে যাবেন?

ড. মুহম্মদ মফিজুর রহমান

পিএইচডি'র উদ্দেশ্যে যখন আমি চীনে গমন করি, তখন অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু বা সহকর্মী আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে কেনো আমি চীনে গেলাম! কেনো ইউরোপ বা আমেরিকায় গেলাম না! চীনের এমন কী আছে যে সেখানে পড়তে যেতে হবে!

চীনের মানুষ সম্পর্কে আমাদের দেশের সিংহভাগ মানুষের ধারণা হচ্ছে - চোখ ছোট, নাক বোচা, লম্বায় খাটো একটা জাতিগোষ্ঠী হচ্ছে চীনারা। তারা কথা বলতে পারে না বা কম কথা বলে। সাপ, ব্যাঙ, শিয়াল, কুকুর যা পায় তাই খায়। আর দেশটি আমাদের দেশ হতে কিছুটা উন্নত, তারা ক্ষুদ্র শিল্পের নিম্নমানের দ্রব্য প্রস্তুত করে দুনিয়াব্যাপী কম মূল্যে বিক্রি করে কিছু অর্থবিত্তের মালিক হয়েছে, যা ইউরোপ আমেরিকার কাছে কিছুই না।

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের এমনসব চিন্তার সাথে বাস্তবের প্রায় মিল নেই বললেই চলে। সে আলোচনা এই নিবন্ধের শেষ দিকে করার আশা রাখি। কেনো আমাদের জনগণের চীন সম্পর্কে এমন ধারণা হয়েছে প্রথমে সে বিষয়ে দুইটি কথা বলতে চাই।

১. অল্প কিছুদিন আগেও চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের দেশের মতই ছিলো। ৪০ বছর আগের চীনের দৈনন্দিন জীবন ও বর্তমান চিত্র যে অকল্পনীয় পরিবর্তন হয়েছে, সেটা না দেখলে বোঝার উপায় নেই। ৪০ বছর আগেও খাবারের অভাবে গণচীনের মানুষ আশেপাশের বিভিন্ন দেশে চলে যেত। তাইতো মালয়েশিয়ার ৩০% মানুষ চীনের অধিবাসী। সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ডসহ আশেপাশের অনেক দেশেই বিপুল পরিমাণ চীনের মানুষের স্থায়ী বসবাস দেখা যায়।

২. চীনের মানুষ প্রচন্ড রকমের রক্ষণশীল। অন্য দেশের সংস্কৃতি হতে তারা তাদের সংস্কৃতি আলাদা করে রেখেছে। এমনকি ৯০ সালের আগ পর্যন্ত চীনারা ইংরেজি ভাষা পর্যন্ত তাদের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে নাই। বিশ্বের সাথে একাকার না হয়ে নিজেদেরকে গুটিয়ে রেখেছে দীর্ঘকাল। অর্থ্যাৎ যতদিন বিশ্বকে নিজের অধীনে না নিতে পেরেছে, ততদিন তারা বিশ্ব হতে আলাদা রয়েছে। আজও পর্যন্ত চীনের মানুষ ফেসবুক,গুগল, বা ইউটিউব ব্যবহার করে না। এ ধরনের সোশ্যাল মিডিয়ার বিকল্প তারা নিজেরা তৈরি করে নিয়েছে। এছাড়া প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অবাধ প্রবাহ চালু না থাকায় বিশ্ব হতে চীন অনেকটাই আলাদা করে রেখেছে নিজেকে। ফলে চীনে না গিয়ে দেশটির সাম্প্রতিক অভাবনীয় উন্নয়ন বোঝা কঠিন।

চীন সম্পর্ক এদেশের মানুষের যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তা নিয়ে কিছু বলতে চেয়েছিলাম, সেই কথায় এখন আসছি। চীনের মানুষের বর্তমান গড় উচ্চতা ৫ ফুট ৭.৬ ইঞ্চি, যেখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেই সংখ্যা ৫ ফুট ৪.৪৮ ইঞ্চি। বৃদ্ধদের নাক ভোতা দেখা গেলেও, এখন অধিকাংশ যুবক যুবতীদের নাক সরু দেখা যায়। তবে চোখের আকার এখনো তেমন বড় করতে তারা পারেননি, হয়ত তারা সেটা চানও না।

আর খাদ্যাভ্যাস! সেতো দুনিয়াব্যাপী ভিন্নতা রয়েছে। এমনকি একটি দেশের মধ্যেও রয়েছে অনেক ভিন্নতা। আমাদের দেশের সমতলের মানুষদের থেকে পাহাড়িদের খাদ্যাভ্যাসে অনেক ভিন্নতা রয়েছে। সাওতাল, চাকমা, মগ, মুরং এর খাদ্যাভ্যাসও কিন্তু অনেক ভিন্ন। আবার ধর্মীয় বিধিনিষেধও মানুষকে ভিন্ন খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত করে রাখে। এদেশের কেউ যে সাপ, ব্যাঙ বা কুকুর খায় না - তা কী আমরা বলতে পারি? আবার কেউ খায় বলে 'বাংলাদেশীরা খায়' বলে মন্তব্যও সঠিক নয়।

আজকের আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে চীনের লেখাপড়া। প্রকৃতপক্ষে সে আলোচনাই করেছি এতক্ষণে। কারণ চীনারা তাদের শিক্ষাব্যবস্থা কে এমন স্তরে নিয়ে গেছে যে, তারা তাদের দৈহিক গঠন পর্যন্ত পরিবর্তন করে ফেলেছে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা দিয়ে। ২০১৪-২০১৯ পর্যন্ত এই সময়েই চীনের মানুষের গড় উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে ১.২৭ সে.মি.। চীনের প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেন এক একটা গবেষণাগার। সেখানে শিক্ষকেরা হচ্ছেন রিসোর্স পারসন। গবেষণাই তাঁদের কাজ। আর রাষ্ট্রের কোনো সিদ্ধান্তই গবেষণা ছাড়া হয় না।

আমেরিকা কেনো পৃথিবীর রাজা? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে - পৃথিবীর সেরা দশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটিই সেখানে (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ সহ)। এই বাস্তব উপলব্ধি হতেই চীন সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জোর দিতে থাকে এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের গবেষণালব্ধ শিক্ষা পদ্ধতি দিয়ে প্রযুক্তিতে বিশ্বের উঁচু স্থানে পৌঁছেছে। শিক্ষার খরচ যে ব্যয় নয় - বিনিয়োগ, সেটা তাঁরা তাঁদের মগজে সেট করে নিয়েছেন।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন বলে মনে করি। পশ্চিমা উন্নত দেশগুলো হয়ত শতবছরের পুরোনো। নিঃসন্দেহে তৎকালীন সময়ে তারা উন্নয়নের স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু এখন সেটা স্ট্যাবল হয়ে গেছে। সুউচ্চ ভবন গুলি ইতিহাসের স্বাক্ষী হিসেবে স্থির ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে চীনে একটা কথা প্রচলিত আছে - China changes everyday. অকল্পনীয় উন্নয়ন চীনকে প্রতিদিনেই পরিবর্তন করে ফেলে। একটা উদাহরণ দিতে চাই এ প্রসঙ্গে। একটা কৃষি মাঠে দাঁড়িয়ে কৃষকের সাথে ফটো তুলে ফেসবুকে আপলোড করলাম ২০১৮ তে, তার ছয় মাস দশ দিন পরে দেখলাম সেখানে চব্বিশ তলা ফাউন্ডেশন করে কয়েকটি ভবনের আঠারো তলায় কাজ চলছে। প্রযুক্তির এমন উদাহরণ দেখতে চাইলে এখন কেবলমাত্র চীনেই যেতে হবে।

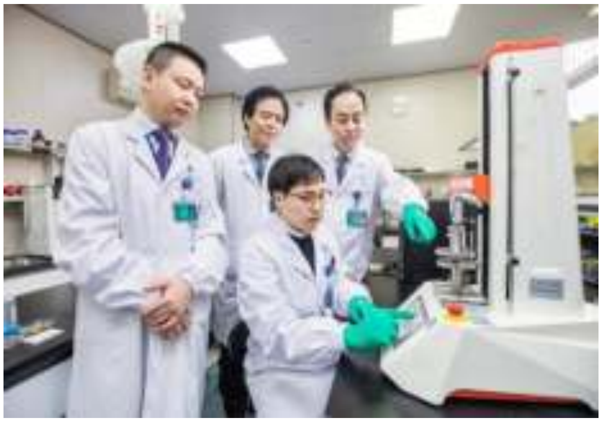

উন্নত দেশ সমূহের সকল প্রযুক্তিকে টপকিয়ে চীন এখন প্রযুক্তির শীর্ষে অবস্থান করছে। ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকো বে'তে নির্মিত পৃথিবীর সেরা প্রযুক্তি নির্ভর শহর 'সিলিকন সিটি' কে টপকিয়ে ২০১৮ সালে চীনের উহানে তৈরি হয়েছে 'ফাইবার অপটিক ভ্যালি'। ১০ মিলিয়ন মানুষের জন্য উপযোগী এই ইকোলজিকাল ভ্যালি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি ইনোভেশন হাব। যা পৃথিবীর নজর কেড়েছে।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা বিষয় হচ্ছে - শিল্প বিল্পবের পরে পৃথিবী যখন পরিবেশগত ভারসাম্য হারিয়েছে, চীন সেখানে ভারসাম্য ঠিক রাখতে অসংখ্য ইকোলজিকাল প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছে। তাছাড়া জীবন মানকে উন্নত করার পাশাপাশি প্রকৃতিকে ঠিক রাখার দিকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। সেজন্য শতশত পাহাড় কে ঠিক রেখে সুড়ংগ করে হাজার কিলোমিটার ট্রেন লাইন নির্মাণ করে অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

প্রযুক্তিতে বিশ্ব জয় করে চীন এবার বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। তাই তাদের দেশের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের লক্ষে পৃথিবীর মানুষের জন্য দ্বার উম্মুক্ত করে দিয়েছে। পৃথিবীব্যাপী মেধাবীদের জন্য তাদের রয়েছে বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপের ব্যবস্থা।

তারমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ফান্ড হতে প্রদত্ত স্কলারশিপ (CUP), চায়না স্কলারশিপ কাউন্সিল (CSC) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য রয়েছে চায়নিজ বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের (MofCom) স্কলারশিপ।

আরেকটা বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, বাংলাদেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া একজন শিক্ষার্থীর পিছনে যত টাকা প্রয়োজন হয়, সেই টাকা দিয়ে চীনে মান সম্পন্ন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পাশাপাশি যদি কেউ বাস্তব জীবনে উন্নয়নের চিত্র দেখে জ্ঞান অর্জন করতে চায়, তবে তাঁকে চীনে যেতে হবে।

লেখক :
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা), আইডি-১৫০৮৪
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর বাংলাদেশ, ঢাকা।
পিএইচডি, হুয়াজং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, উহান, চীন।

সাক্ষাৎকার

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, বিসিওয়াইএসএ এর ষান্মাসিক 'মহাপ্রাচীর' ম্যাগাজিনের সপ্তম সংখ্যার বিশেষ সাক্ষাৎকারে আমাদের সঙ্গে চীনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছেন চীনের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে সর্বজন পরিচিত ড. কিশোর বিশ্বাস। বর্তমানে তিনি চীনের জেজিয়াং প্রদেশের হানঝো শহরের হুয়াওয়ে ট্রেনিং কোম্পানি লিমিটেডে আইটি ট্রেনিং ডিরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছেন। পূর্বে তিনি চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরেইন এক্সপার্ট এডুকেটর এবং বেইজিং হুইজিয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরেইন এক্সপার্ট লেকচারার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি চীনের সিনহুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী ও পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। ছাত্রজীবনে তিনি বাংলাদেশে "ও লেভেল" পরীক্ষায় অষ্টম, ১৯৯৭ সালে টেলিভিশন বিতর্ক অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ বক্তা, ২০০৮ সালে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সট্রাঅরডিনারি ফরেইন স্টুডেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ২০১১ সালে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সট্রাঅরডিনারি ফরেইন স্টুডেন্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন। তিনি অনেক চীনা বইয়ের অনুবাদ ও চীনা ও বাংলা অভিধান ও বইয়ের লেখক। চলুন, চীন প্রবাসী ড. কিশোর বিশ্বাসের শিক্ষা, কর্ম ও স্বাভাবিক জীবনাচরণের নানান অভিজ্ঞতা আমরা জেনে আসি।

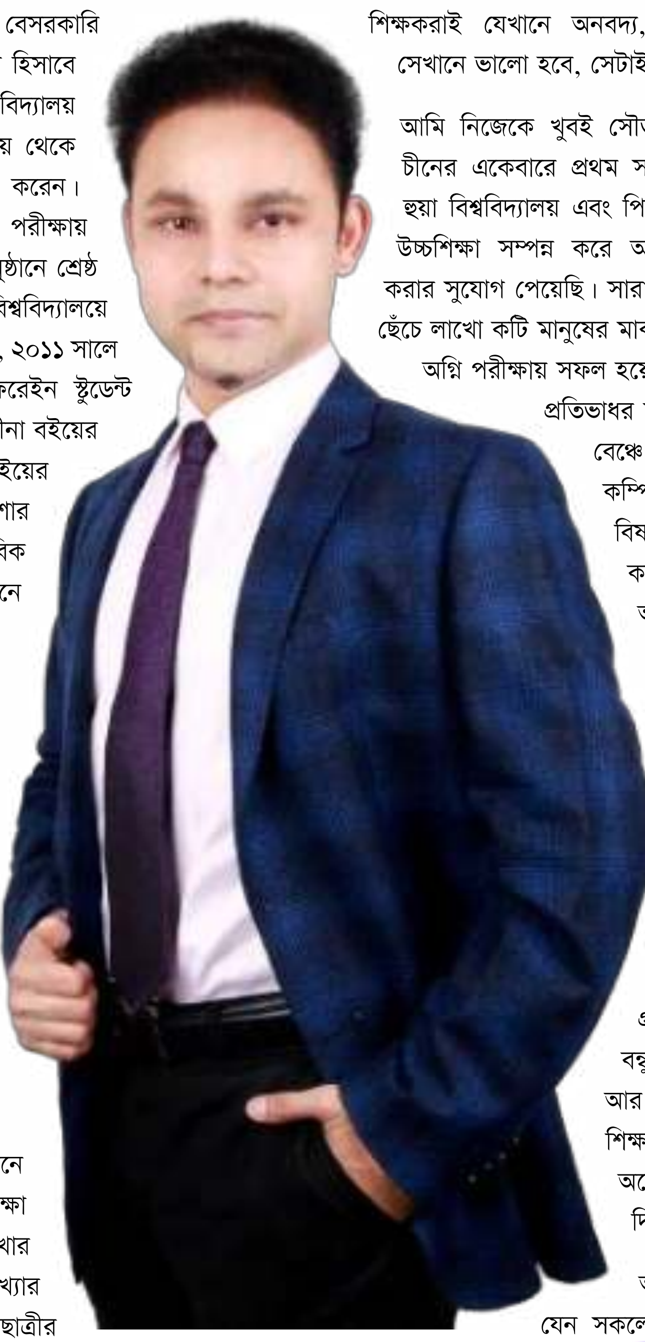

১। আপনি কেমন আছেন?

ড. কিশোর বিশ্বাসঃ জি আমি ভালো আছি। ধন্যবাদ।

২। আমরা জানি, আপনি চীনে কম্পিউটার সাইন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক, মাস্টার্স এবং পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন। চীনে কম্পিউটার সাইন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা জানতে চাই।

ড. কিশোর বিশ্বাসঃ ধন্যবাদ আপনাকে। চীনে দীর্ঘ ১৩ বছরের শিক্ষাজীবনে চীনের শিক্ষা ব্যবস্থার খুঁটিনাটি খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। জনসংখ্যার বিশালত্বের হিসাবে এখানে মেধাবী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা অনেক। ছোটবেলা থেকেই যারা মূলত বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গণিত বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ ও পারদর্শিতা নিয়ে বেড়ে উঠছে। তার উপর প্রবল প্রতিযোগিতা আর বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা বা "কাও খাও" এর চাপ থাকায় এক বিশাল অংশের ছাত্রছাত্রী তাদের সবটুকু মনোযোগ উজাড় করে পড়াশুনা করে। আর এমনি পরিশ্রমী মেধাবী মানুষের সমাহার বেশি ঘটে চীনের নামকরা প্রথম সারির বিদ্যালয় গুলোতে। তাই বিদ্যাপীঠের মূল প্রতিপাদ্য ছাত্র-শিক্ষকরাই যেখানে অনবদ্য, সার্বিক শিক্ষার মান সেখানে ভালো হবে, সেটাই স্বাভাবিক।

আমি নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করি যে চীনের একেবারে প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়, ছিং হুয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে আমি সেখানে শিক্ষকতা করার সুযোগ পেয়েছি। সারা চীনের আনাচে কানাচে ছেঁচে লাখো কটি মানুষের মাঝ থেকে শিক্ষা ও মেধার অগ্নি পরীক্ষায় সফল হয়ে বাছাই হয়ে আসা তীক্ষ্ণ প্রতিভাধর সহপাঠীদের সাথে একই বেঞ্চে বসে বিজ্ঞান প্রযুক্তি, কম্পিউটার সাইন্সের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পেরেছি। এদের অনেকেই বিশ্বের নামকরা প্রতিযোগিতা, যেমন এ সি এম কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা কিংবা গণিত অলিম্পিয়াডের স্বর্ণ, রৌপ্য বিজয়ী। এই বিদেশ বিভুই-এ চীনা ভাষায় প্রযুক্তি শিক্ষা গ্রহণে তাদের অমায়িক বন্ধু-সুলভ সহযোগিতা আর অনুপ্রেরণা আমার শিক্ষাজীবনের পথচলাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে।

আর এখানকার শিক্ষকরা যেন সকলের সম্মানের প্রতিমূর্তি।

নম্র-বিনয়ী জ্ঞানের আধার শিক্ষক-শিক্ষিকারা এখানে নিজে হাতে গড়ে তোলেন আগামী প্রজন্মকে। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তবে এখানে প্রথম দুই, তিন বছর চীনা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে আমার যার পর নেই বেগ পেতে হয়েছে। এর পর থেকে ভাষাটা রপ্ত হয়ে যেতে থাকায় ধীরে ধীরে হালে পানি পাই। তবে কম্পিউটার প্রকৌশলের মতো বিষয় নিয়ে হাতে কলমে এখানকার সহপাঠী শিক্ষকদের সহায়তায় মূল শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করা এবং বিদেশী ছাত্র হিসাবে এখানকার ক্যাম্পাস জীবন সত্যিই এক দারুণ অভিজ্ঞতা।

৩। চীনের হুয়াওয়ে ট্রেনিং কোম্পানি লিমিটেডে আইটি ট্রেনিং ডিরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছেন। চীনে শিক্ষা জীবন শেষে চাকুরিতে যোগদান করা কতটা সহজ? চীনের কর্মজীবন ও স্বাভাবিক জীবনাচরণ নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা হতে আমাদের পাঠকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন।

ড. কিশোর বিশ্বাসঃ চীনে বিদেশীদের জন্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায় চীনা মিডিয়ামে শিক্ষাগ্রহণ। এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু বিষয়ে ইংরেজি মিডিয়ামে কোর্স থাকলেও চীনা ভাষাতে শিক্ষা গ্রহণ-ই মূল ধারা, যে ধারার বৈতরণী পার হতে বেশিরভাগ বিদেশি ছাত্র ছাত্রীদেরকে হিমশিম খেতে হয়। তবে সর্বশক্তি দিয়ে ধৈর্য ধরে একবার ভাষা-সংস্কৃতিটা রপ্ত করে, ভালো ফলাফল নিয়ে উচ্চশিক্ষা শেষ করতে পারলে, ফসল ঘরে তোলার নবান্ন একদিন আসেই। At the end of the day, that hardship pays off. শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার পাশাপাশি একাধিক ভাষায় পারদর্শিতা একটা বড় প্লাস পয়েন্ট হিসাবে গণ্য হয় এখানকার চাকুরীর বাজারে।

আমরা হয়ত অনেকেই জানি, গড়পড়তা চীনা মানুষ অধিকাংশই তুলনামূলক কর্মঠ। এ যুগে অনেক প্রযুক্তি কোম্পানির অলিখিত নিয়ম হল-- "৯৯৬" এর শ্লোগান । "৯৯৬" মানে হচ্ছে, সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সপ্তাহে ৬ দিন কাজ। আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার সফল ভাবে পার হয়ে আসা সেই সব অসম্ভব মেধাবী ছাত্রদের এহেন কর্মঠ জীবন, চীনের আজকের সফলতার অন্যতম প্রধান কারণ। তবে এখানে কর্মজীবন ও পারিবারিক-সামাজিক জীবনের মাঝে সামঞ্জস্য বজায় রাখার উপরও জোর দেয়া হয়। আমার দেখা মতে এখানকার কর্মস্থলের পরিবেশ খুব উন্নত। যার ফলে দিনের প্রায় অর্ধেকটা সময় অফিসে কাটিয়ে দিতে খারাপ লাগে না। ব্যক্তিগত ভাবে আমি অফিসের পাশেই বাসা নেয়াতে, অফিস-বাসায় প্রায় সমান সময় কাটাতে পারি।

সবশেষে পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, যেকোনো জায়গাতেই, যে কোন পরিবেশেই নিজের মূল প্রতিভাকে খুঁজে নিয়ে তার চর্চা করে, সত্যিকারের দক্ষতা অর্জন করত: কর্মক্ষেত্রে নিজেকে অপ্রতিস্থাপন-যোগ্য বা Irreplicable করে গড়ে তুলতে পারলে সফলতা শুধু সময়ের ব্যাপার। আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, কর্মক্ষেত্রে বা সমাজের প্রতি আমরা নিজেরা কী মূল্য যোগ করতে পারছি, অর্থাৎ আমাদের কাজ কী value create করছে? সেই মূল্য মানেই সবাই আমাদেরকে মূল্যায়িত করবে। সর্বোপরি আমি মনে করি, চীনে শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও জীবনযাপন সার্বিক বিবেচনায় সুখকর।

৪। আমরা জানি, আপনি দীর্ঘ দিন চীনে অবস্থান করছেন, এবং পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে "এক অঞ্চল, এক পথ" নিয়ে কাজ করছেন, বাংলাদেশের কাঠামোগত উন্নয়নে চীনের ভূমিকা ও বন্ধুপ্রতীম দুই দেশের সম্পর্ক আরও বৃদ্ধিতে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে? এই বিষয়ে আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন।

ড. কিশোর বিশ্বাসঃ এক পথ এক অঞ্চলের শ্লোগান আশাব্যঞ্জক। পৃথিবীর সবাই যদি সত্যিকার অর্থে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসে, দেশ জাতি নির্বিশেষে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ সমস্যারই সুরাহা হওয়া সম্ভব। চীন বাংলাদেশ বন্ধুত্ব অটুট থাকুক, হিমালয়ের দুই পারের মানুষ পরস্পরের প্রতি আরও বেশি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিক এটা আমাদের সবারই কাম্য।

অসংখ্য ধন্যবাদ মহাপ্রাচীর ম্যাগাজিনের বিশেষ সাক্ষাৎকারে পাঠকদের সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করার জন্য। আশা করি, আপনার অভিজ্ঞতার ঝুলি হতে তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে বাংলাদেশী শিক্ষার্থী ও কর্মজীবীরা চীনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ও চাকুরি করতে আরও বেশি অনুপ্রাণিত হবে।

সাক্ষাৎকারগ্রহীতা : এ বি সিদ্দিক
সহকারী সম্পাদক, মহাপ্রাচীর

চীনের মহান গার্ডিয়ান সিংহ : ইতিহাস, সাংস্কৃতি এবং পৌরাণিকতা

মারুফ হাসান

আপনি চীনে ছিলেন কিংবা চীনা সিনেমা বা নাটক দেখেছেন কিন্তু পাথর কিংবা ব্রোঞ্জ এর তৈরি সিংহের ভাস্কর্য দেখেননি তা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, এগুলো সংখ্যায় এতই বেশি যে, আপনি চীনের রাস্তায় চলার পথে ১০০ মিটারের মধ্যে দু-একটা সিংহের ভাস্কর্য চোখে পড়বেই। এই সিংহের ভাস্কর্য চীনাদের কাছে গার্ডিয়ান সিংহ বা অবিভাবক সিংহ নামে পরিচিত। এই ভাস্কর্যগুলো কেবলমাত্র ঐতিহাসিকভাবে বা চীনা সংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র্যসূচক দিক হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং চীনা শিল্পকর্মের সৃজনশীলতারও বড় নিদর্শন। আজ আমি আপনাদের সাথে চীনা গার্ডিয়ান সিংহের ইতিহাস, সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং পৌরাণিকতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, যা এরপর চীনে চলার পথে যখনই এই ভাস্কর্য আপনাদের চোখে পরবে, তখনই আপনাদেরকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে এটি দেখতে ও বুঝতে সাহায্য করবে।

চীনা ভাষায় এই সিংহের ভাস্কর্যকে শিশি (石狮) বলা হয়ে থাকে। চীনে সিংহের জন্য সাধারণত "শি" শব্দটি ব্যবহৃত হয়, আর "পাথরের সিংহ" এর জন্য "শিশি" শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিছু নৃতত্ত্ববিদ বিশ্বাস করেন যে, সিংহের জন্য চীনা "শি" শব্দটি ফার্সি শব্দ "সের" থেকে এসেছে। ইংরেজিতে, এরা "Foo dogs" বলে পরিচিত। কারণ হয়তোবা, পশ্চিমারা খুব বেশি কুকুর পছন্দ করে তাই। তবে চৌ চৌ (Chow Chow) নামের এক ধরনের কুকুরের জাত রয়েছে যা ঠিক সিংহের মতোই দেখতে। Foo শব্দটি সম্ভবত Fe (佛) থেকে অনুবাদ, যার অর্থ বুদ্ধ, বা Fu (福), যার অর্থ সৌভাগ্য। জাপানি ভাষায় এদেরকে বলা হয় কোমাইনু (Komainu)। এছাড়াও কোরিয়া এবং অন্যান্য এশীয়ান দেশগুলিতে চীনা সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের সংস্কৃতিতে একই রকম কিছু ভাস্কর্য রয়েছে। যদিও তাদের অভিভাবক সিংহ দেখতে কিছুটা আলাদা।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হান রাজবংশের দরবারে মধ্যএশীয় রাজ্য যেমন সমরকন্দ এবং ইউয়েঝি থেকে রাষ্ট্রদূত এবং দূতরা সর্বপ্রথম এই এশীয় সিংহের কারুশিল্প নিয়ে আসেন। একই সময়কাল থেকে সিল্ক রোড রুটে বাণিজ্য প্রসারিত হতে শুরু করে এবং ভ্রমণকারী সন্ন্যাসী এবং বণিকদের বর্ণনাও রয়েছে। এই বিবরণগুলি ২৫-২২০

খ্রিষ্টাব্দের সময়কালে লেখা "লেটার হান" বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

হান রাজবংশের প্রথম দিক থেকেই, চীনা বৌদ্ধ ধর্মে শিখিয়েছে আসছে যে, এই পৌরাণিক অভিভাবক সিংহদের বিশেষ প্রতিরক্ষামূলক ক্ষমতা রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, সর্বদা বৌদ্ধ মন্দিরের উপর প্রতিরক্ষার জন্য নজর রাখা। অভিভাবক সিংহের মূর্তি এখনও চীনসহ এশিয়ার অন্যান্য ১০টি দেশের অসংখ্য ভবনের সামনে দেখা যায়। সাধারণত রাজকীয় সমাধি, বৌদ্ধ মন্দির এবং প্রাসাদ এবং সরকারি ভবনগুলির মুল ফটকে অভিভাবক সিংহের স্থাপন করা হয়ে থাকে। এমনকি বাণিজ্যিক ভবন, যেমন দোকান, হোটেল বা অন্যান্য ব্যবসা এবং ঐতিহ্যগতভাবে সমাজের উচ্চ পদস্থ নাগরিকদের বাড়ির সামনে স্থাপন করা হয়ে থাকে যা তাদের আর্থিক এবং সামাজিক মর্যাদা নির্দেশ করে। মৃৎশিল্প এবং অঙ্কনবিদ্যার মতো শিল্পকর্মের মধ্যেও এই অভিভাবক সিংহদের অবস্থান রয়েছে। তবে ঐতিহ্যগতভাবে এই সিংহগুলি মার্বেল, গ্রানাইট বা ব্রোঞ্জ অথবা লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে।

পাথরের সিংহগুলো চীনের সমস্ত নিষিদ্ধ শহরের প্রবেশদ্বারে পাহারার জন্য স্থাপন করা হয়েছে, যা খোদাই-করা প্রতিমূর্তির চীনা সংস্কৃতির গভীর গুরুত্ব প্রদর্শন করা হয়েছে। এদের নকশা ও তৈরি শৈলী এককে রাজবংশীয় যুগে এককে রকম। হান রাজবংশ এবং তাং যুগে সৃষ্ট সিংহগুলি প্রভুত্বব্যঞ্জক এবং বিশাল আকৃতির। ইউয়ান রাজবংশের লোকেরা সিংহগুলিকে পাতলা এবং পেশীবহুল করে তৈরি করেছে। পরবর্তীতে মিং এবং কুইং যুগে পাথরের সিংহগুলো ধীশক্তি এবং অভ্যন্তরীণ প্রশান্তির প্রতিনিধিত্ব করে।

এছাড়া আঞ্চলিকভাবেও এর গঠন এবং তৈরিশৈলীগত পদ্ধতির কিছু পার্থক্য রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের সিংহগুলো তাদের অমিশ্রতা এবং সরল গঠনের দিক দিয়ে দক্ষিণের সিংহদের থেকে আলাদা। দক্ষিণী তৈরিশৈলী বেশ অলঙ্কৃত, কখনও কখনও গয়না এবং অলংকারের আকৃতিতে খোদাই করা, বন্য চুল, প্রশস্ত চোখ, এবং বিভিন্ন ভঙ্গিতে চিত্রিত হয়েছে।

পাথরের সিংহগুলি বড় বড় পাথর থেকে খোদাই করে বা ধাতুতে ঢালাই করে তৈরি করা হয়। এগুলো অত্যন্ত শ্রম-নিবিড়, উচ্চ মাত্রার দক্ষ কারুকার্যের প্রয়োজন এবং তৈরি করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল। এই কারণেই, পাথরের সিংহগুলো সম্পদ, মর্যাদা এবং ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে অভিজাত এবং ধনীদের মধ্যে সম্মানের স্থান অর্জন করেছিল। আধুনিক যুগে, কংক্রিট বা রেজিনে ঢালাইয়ের মতো পদ্ধতিগুলি সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য শিশি সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করে তুলেছে। যার ফলে, সাধারণ চীনা পরিবারের বাড়িতে গুরুত্বপূর্ণ কক্ষগুলো রক্ষা করার জন্য শিশি বাড়ির প্রবেশদ্বারে এবং ভিতরে উভয়ই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

চীনাদের বিশ্বাস এই অভিভাবক সিংহ চীনা পৌরাণিক কাহিনীর ঐশ্বরিক প্রাণীদের মধ্যে একটি, যার খারাপ আত্মা তাড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে। চীনাবিদ্যা অনুসারে, পাথরের সিংহরা "শার চি", বা "বিষের তীর" পরিষ্কার করতে পারে, বিপদ, অসুস্থতা, কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া, অধিক ব্যস্ততা এবং আলোর খুঁটি, স্মৃতিস্তম্ভ এবং ট্রাফিক বাতির অনর্থের মতো ঝাঁকুনিপূর্ণ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। নেতিবাচক আত্মা এবং শক্তি তাড়ানোর এই ক্ষমতাই বৌদ্ধ মন্দিরের প্রবেশদ্বারে এই অভিভাবক সিংহদের স্থাপনের মূল কারণ। সেই বিশ্বাস থেকেই বিভিন্ন প্রাসাদ, গুরুত্বপূর্ণ বাসস্থান এবং সমাধিতে এর স্থাপনের প্রচলন চলে আসছে। তাদের বিশ্বাস অভিভাবক সিংহরা ভাল এবং খারাপ উদ্দেশ্য নির্ণয় করার ক্ষমতা দিয়ে আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তারা আত্মিক জগতে অনুগত কিন্তু হিংস্র অভিভাবক হিসাবে মূল্যবান।

পাথরের সিংহরা চুরির প্রবণতাকে দমন করতে পারে, দুর্ঘটনা কমিয়ে আনতে পারে এবং অসৎ ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করতে পারে, এবং গ্রাহক বা কর্মীদের সন্তুষ্ট করে ব্যবসায় আকৃষ্ট করতে পারে। শিশির এই বৈশিষ্ট্যগুলিই চীনাদের কাছে তাদের ব্যবসার সমৃদ্ধি ও প্রসারের জন্য আরও মূল্যবান করে তোলে। এই কারণেই একজোড়া সিংহকে প্রায়ই হোটেল, রেস্তোরাঁ, ব্যাংক এবং কারখানাগুলোতে পাহারা দিতে দেখা যায়।

চীনের এই মহান অভিবাবক সিংহ সাধারণত জোড়ায় থাকে। একজন পুরুষ সিংহ, একজন নারী সিংহ। যা ইয়িন এবং ইয়াং-এর দীর্ঘ চীনা তাওবাদী ঐতিহ্যের প্রতিফলন করে। পুরুষের ডান থাবা, ইয়াং-এর প্রতীকী। সাধারণত পৃথিবীর প্রতীকী একটি বলের উপর পুরুষের সিংহের একটি থাবা থাকে, যা বাহ্যিক আত্মা এবং ভৌত জগতের উপর আধিপত্য, শক্তি, হিংস্রতা এবং আক্রমণাত্মক সাহসের প্রতিনিধিত্ব করে। পুরুষের আধ্যাত্মিক গর্জন এবং বাহ্যিক নিঃশ্বাসের নির্গমনের মাধ্যমে দুর্ভাগ্য দূর করার জন্য মুখ খোলা থাকে, যা চীনা পবিত্র শব্দাংশ "ওম" এর "ও" ধ্বনি বহিঃপ্রকাশ করে।

মহিলা সিংহ হল ইয়িন এর প্রতীক। তারা লালন শক্তি, সমবেদনা, প্রেমময় যত্ন, পরামর্শ, শিক্ষা এবং মেয়েলি নিরাময় শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি বিল্ডিংয়ের ভিতরের লোকদের রক্ষা করে, ভিতরের আত্মার প্রতিনিধিত্ব করে। তাই মহিলা সিংহের মুখ সাধারণত বন্ধ করে থাকে, যা "ওম" এর "ম" শব্দ বা সৃষ্টির অভ্যন্তরীণ শ্বাসকে চিত্রিত করে।

লেখক :
পিএইচডি শিক্ষার্থী, জনপ্রাশাসন বিভাগ,
হুয়াজং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, উহান, চীন।

মহামারী ও চীন: বিদেশী শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ও চীনের বর্তমান প্রেক্ষাপট

মোঃ হানিফ আল সাব্বির

একবিংশ শতাব্দিতে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যে সকল সমস্যা পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিয়েছে তার মধ্যে ২০২০ এর করোনা মহামারী বিশ্বের জন্য এক অন্ধকার সময় বয়ে এনেছে, যার শেষ কবে তা এখনো কারো জানা নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অবনতি, বিশ্ব অর্থনৈতিক অচলাবস্থা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নৈতিক অবক্ষয় ও স্থিতিশীলতার অভাব পৃথিবীকে একটি বড় চ্যালেঞ্জের এর সামনে দাঁড় করিয়েছে। ২০২২ সালে এসেও আমাদের এই সমস্যাগুলো দূর হয়নি। বরং নতুন সমস্যা আবির্ভাব হয়েছে যার প্রেক্ষাপট আমাদের জন্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে এটা একবাক্যে বলা যায়।

চীন বরাবরের মতো করোনার বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ বজায় রেখেছে। প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং ও তার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় অন্য যে কোন দেশের চেয়ে চীন এই সমস্যা সফলতার সাথে মোকাবেলা করতে পেরেছে। গণটিকা ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত জনগনের স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন ও করোনা প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যা সাম্প্রতিক ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট এর প্রভাব ও নগণ্য মৃত্যু হার এ প্রমাণ করে দেয় চীনের জিরো টলারেন্স নীতির কার্যকারিতা ব্যাপ্যারে।

করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের সাম্প্রতিক চিত্র দেখলে বুঝা যায় চীন তাদের জিরো টলারেন্স নীতিতে বদ্ধপরিকর। চীনা জনগন ও চীনে অবস্থানকারী সবার নিরাপত্যার জন্য তারা সবকিছু করতে প্রস্তুত। এখন পরযন্ত (৯মে, ২০২২) ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট এর ১৫টি নতুন কেস ও ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও সম্ভাব্য কেস প্রায় ৩,৯১৮ জন।

(সোর্স :http ://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/202205/fba738cd4a134897b38ff4b87eb5fb5a.shtml)

আমার লেখার উদ্দেশ্য মোটেও চীনের বর্তমান করোনা পরিস্থিতির উপর নয়। বরং এর কারনে একটি বড় সংখ্যক বিদেশী শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ও তাদের চীনে প্রত্যাবর্তন নিয়ে যে ধোয়াশা সৃষ্টি হয়েছে তাই নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।

দীর্ঘদিন দিন ধরে করোনার কারণে দেশে আটকে পরা বাংলাদেশী ও অন্যান্য দেশের বিদেশী শিক্ষার্থীদের নানা রকম জটিলতার মধ্যে দিয়ে পার করতে হচ্ছে। অনলাইন ভিক্তিক শিক্ষাব্যবস্থা যেমনি হোক না কেনো তা কখনই যথেষ্ঠ নয়। বিশেষ করে মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা যেখানে ব্যাবহারিক বিষয়, সেখানে অনলাইন ব্যবস্থা কখোনই তার বিকল্প হতে পারে না। একই সাথে তাদের ইন্টার্ণশিপও অনিশ্চিত। যার ফলে তারা

ক্রমান্বয়ে অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়ছে যা ভাবনার বিষয়। পিএচডি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এটি একেবারে বলাই বাহুল্য।

সমসাময়িক একটি প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, শুধুমাত্র বাংলাদেশী শিক্ষার্থী প্রায় তিনহাজার চীন-ফেরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি লিখে তাদের চীনে ফেরত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। (সোর্স - The Daily star)

এই অচলাবস্থা সেই ২০২০ থেকে এখনো পর্যন্ত চলমান। ফলশ্রুতিতে, তাদের মানসিক অবস্থা যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, একই ভাবে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে,

"কবে চীন সরকার বিদেশী শিক্ষার্থীদের ফেরত নিবে এবং স্বাভাবিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবে?"

সহসাই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কেননা, এর জন্য যে ধরনের অনুকূল পরিস্থিতির প্রয়োজন তা সৃষ্টি হয়নি। একইভাবে, বাহির থেকে নানাভাবে আসা করোনা ভ্যারিয়েন্ট চীনের জিরো টলারেন্স নীতির উপর প্রভাব সৃষ্টি করছে। অন্য দেশের তুলনার চীন জনগনের নিরাপত্তার স্বার্থে কোনো আপস করতে রাজী নয়। তাই কঠোর লকডাউন বরাবরের মতো প্রয়োগ হচ্ছে চীনে যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলছে। সাম্প্রতিক সাংহাই শহরের লকডাউন এর বড় উদাহরণ।

তবে এতো নিরাশার মধ্যে কিছু আশার আলো দেখা যাচ্ছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে যে বিদেশী শিক্ষার্থীদের উচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীর প্রত্যাবর্তনের সমন্বয় তারা করছে।

প্রাথমিক ভাবে ২৫১ জন পাকিস্তানি ছাত্র যাদের প্রক্রিয়া করা হচ্ছে এবং শীঘ্রই চীনের উদ্দেশ্যে তারা রওনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে, পরবর্তীতে ১৩০০ থেকে ১৫০০ জন যেতে পারবে, তবে এটি ২৫১ জন শিক্ষার্থীর এই পাইলট প্রকল্পের উপর নির্ভর করবে যে তারা কতটা সহজে চীনে প্রবেশ করবে। চীন প্রতিটি দেশের ২০০+ শিক্ষার্থীকে একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে ডাকছে এবং যে নির্দিষ্ট দেশটি কোভিডের বিরুদ্ধে কতটা প্রতিরোধী এবং সেই শিক্ষার্থীরা কোভিডের এসওপি সম্পর্কিত নিয়ম ও নীতিগুলি কতটা মেনে চলে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। (সোর্স - phronesis media 4 May, 2022)

চীনের এ সকল পাইলট প্রকল্প যদি সফলকাম হয় তবে এটি আমাদের ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বড় সুখবর। কিন্তু এখানে অনেক যদি এবং উচ্চ ব্যয় এর বিষয় রয়েছে, এছাড়াও দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কতটুকু আমাদের শিক্ষার্থীদের জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করেছে সেটাও দেখার বিষয়। একটি বড় সংখ্যক শিক্ষার্থীরা যে ঝরে পড়েছে এবং পড়ছে সেটা ভাববার বিষয়। একইভাবে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার মান বাড়াতে চীনা সরকার কি ধরনের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করবে এবং করোনা থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা করবে তাই এখন দেখার বিষয়।

লেখক :
স্নাতক শিক্ষার্থী, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ,
ছাংঝো ইউনিভার্সিটি, ছাংঝো, জিয়াংসু, চীন।

চীনা বিমান নামকরণ পদ্ধতি ও একটি প্রচলিত কুসংস্কার!

মাইন উদ্দিন

চীনারা চার সংখ্যাটাকে ভীষণ অশুভ ভাবে। এই Tetraphobia এতোটাই প্রকট যে, বিমানের মডেল নামকরণের ক্ষেত্রেও ৪ এর ব্যবহার পরিহার করা হয়। চাইনিজ বিমান নামকরণ শুরু হয় সরাসরি ৫ থেকে, কারণ ১ থেকে শুরু করলে মাঝখানে ৪ আসবে, তাই সরাসরি ৪ এর পর থেকে শুরু। যেমনঃ Harbin Y5, Shenyang J-6B।

শুধু বিমানের নাম্বার নয়; গাড়ির নাম্বার প্লেটেও কদাচিৎ ৪ চোখে পড়বে। আরো অবাক করা ব্যাপার হলো, এরা ৪ তলা বাড়ি না বানিয়ে হয় এর চেয়ে কম বা এর চেয়ে উঁচু বাড়ি বানায়। ৪ কে এত ভয় পাওয়ার কারণ হলো '四-sì বা চার' এর উচ্চারণ এবং 死-sǐ বা মৃত্যু এর উচ্চারণ এর মিল। মৃত্যুকে অশুভ ভেবে এর উচ্চারণের সাথে চার এর উচ্চারণের সামঞ্জস্য থেকে এই কুসংস্কার এর জন্ম, যদিও আধুনিক প্রজন্মের চীনারা এই প্রথা শিথিল করছে।

চাইনিজ বিমান নামকরণ পদ্ধতিও বেশ আলাদা। বাদবাকি বিশ্বের অনুরূপ নয়, বরং চাইনিজ ক্যারেক্টার অনুযায়ী বিমানের প্রকার অনুসারে H, Z, L, Y, J, X, Q, U, S, JJ, CJ, JH, JZ, QD এসব ডেজিগনেশন দেওয়া হয়। যেমনঃ

WZ- ওরেনজিই (UAV)

J- জিয়াঞ্জিজি (Fighter Aircraft)

X- সিয়াংজি (Glider)

S- শোয়েইশাংজি (Amphibian Aircraft)

Y- ইয়ুনশুজি (Transport Aircraft)

লেখক :
স্নাতক শিক্ষার্থী, বিমান প্রকৌশল বিভাগ
শেনইয়াং মহাকাশ বিশ্ববিদ্যালয়, শেনইয়াং, চীন।

চীনের একটি পাহাড়ি পরিবারের গল্প

অজয় কান্তি মন্ডল

পাহাড়ের মধ্যমনি চীনের ফুজিয়ান প্রদেশের রাজধানী 'ফুজো' শহর। শহরে চলার পথে চারদিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা আকাশচুম্বী সুউচ্চ পর্বতমালা সকলকে ভালোভাবে জানান দেয় শহরটিও একসময় পাহাড়ের দখলে ছিল। এই ফুজো শহরের একেবারে শেষ প্রান্তেই আমাদের বসবাস। আমাদের বলতে আমি, আমার স্ত্রী ও আমার ছয় বছরের মেয়ে 'অন্ত'। আমাদের বসবাসের কমিউনিটিটি পাহাড়ের একেবারে কাছাকাছি হওয়ায় বাসার দুইপাশের খোলা বেলকনি দিয়ে চোখ রাখতেই ধরা দেয় পাহাড়ি প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, মাঝরাত থেকে শেষরাত সকল সময়ে পাহাড়ি প্রকৃতির এমন অপরূপ লীলা মনে এনে দেয় স্বপ্নিল এক অনুভূতি। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ ঋতুতে পাহাড়ি প্রকৃতি যেন আবির্ভূত হয় একান্তই তার নিজস্ব কিছু রূপে। রৌদ্রজ্জ্বল দিনে যেমন নীল আকাশে সাদা মেঘের সাথে পাহাড়ের খুনসুটি ঠিক তেমনি বৃষ্টির দিনে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত কালো মেঘের ঘনঘটা মাঝেমধ্যে মনকে নিয়ে যায় অসীম কল্পনার রাজ্যে।

আমাদের বসবাসের কমিউনিটিটি ভালো লাগার বেশ কিছু কারণের মধ্যে অবাধে এমন প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন অন্যতম একটি কারণ। এই কমিউনিটির পরে আর কোন কমিউনিটি নেই। কিন্তু এর পরেও পাহাড়ি প্রকৃতিকে ঘিরে বহু মানুষের বসবাস রয়েছে। সময় পেলেই আমরা বেরিয়ে পড়ি কিছুটা অজানাকে জানার উদ্দেশ্যে। কেননা, শৈশব থেকেই কাদামাটি মেখে বেড়ে ওঠা গ্রাম্য প্রকৃতি বরাবরই আমাদের খুব ভালো লাগে। তাই শহরের উল্টো দিকে অবস্থিত এসব গ্রামের পানে আমরা নিয়ত ছুটে চলি। সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের আশাপাশের পাহাড়গুলোর পাদদেশ বা চূড়ার কাছাকাছি অবস্থিত গুচ্ছ গ্রামের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করা মানুষগুলোর হাল-হকিকত আমরা স্বচক্ষে বহুবার পর্যবেক্ষণ করেছি।

ঠিক তেমনই একদিন হাজির হয়েছিলাম আমাদের বাসা থেকে প্রায় ২৫ কি.মি. দূরে পাহাড়ের বেশ গভীরে অবস্থিত একটি গ্রামে। বাহন হিসেবে আমাদের ই-বাইক সঙ্গী হয়েছিল। বরাবরের মত সেদিন বের হলেও উদ্দেশ্য ছিল লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী চীনাদের গ্রাম্য পরিবেশ, দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা একটু ভারী করা। সেজন্য একটু বেশি সময় হাতে নিয়েই সেদিনের যাত্রা।

এই দীর্ঘ পথ যাওয়ার সময়ে আশাপাশে বহু পরিবার চোখে পড়ল। চোখে পড়ল পাহাড়ের গাঁ ঘেঁষে তৈরিকৃত ২-৩ তলা বিশিষ্ট পাকা বাড়ি যেগুলো খুব বেশি দিনের পুরানো বলে মনে হল না। তবে বেশ পুরনো, টালির ছাউনি বিশিষ্ট মাটির দেয়ালে বা কাঁচা ইটের দেয়ালে ঘেরা দুই তলা বিশিষ্ট অনেক ঘরবাড়িও আমরা দেখলাম। পাহাড়ি জনপদ হলেও যাতায়াত ব্যবস্থা বেশ ভালোই। রাস্তা সরু হলেও পুরোটাই পিচ ঢালাই এবং সেখানে দুইটি প্রাইভেট কার অনায়াসেই ক্রস করতে পারে। আমরা হেলেদুলে চলা আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তার পথ ধরে যেতে লাগলাম। যেতে যেতে পিচ ঢালাই রাস্তার একেবারে শেষ প্রন্তে পৌঁছালাম। কিন্তু তখন ও ই-বাইক নিয়ে যাওয়ার মত ব্যবস্থা ছিল। আমরা আরও কিছুদূর গেলাম। এতক্ষন বেশ যানবাহন ও মানুষের আনাগোনা চোখে পড়লেও সরু ওই রাস্তাটি ছিল বেশ নিরিবিলি। তখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমরা লোকালয় থেকে বেশ দূরেই চলে এসেছি। পথিমধ্যে দীর্ঘ সময় পর ১ জনের দেখা মিলল। সে আমাদের দেখে একটু অবাকই হল এবং বলল 'এদিকে আর যাওয়ার জায়গা নেই। তোমরা ফিরে যাও'। অল্পস্বল্প চীনা ভাষা বুঝতে পারা এবং ওনার হাতের ইঙ্গিত তেমনটাই জানান দিচ্ছিল। ওনার কথায় আমরা বুঝলাম হয়ত সামনে আর লোকালয় নেই। তাছাড়া এরপরের রাস্তাটুকু ছিল একটু নড়বড়ে। বড় বড় পাথরের টুকরা দিয়ে বানানো ওই রাস্তাটির একপাশে বেশ উঁচু জলরাশি চুইয়ে অপর পাশে প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানকার পানি এতটাই স্বচ্ছ ছিল যেটার তলদেশে পাথরের বড় টিলার উপর দিয়ে অবাধে মাছের বিচরন দেখতে পেলাম। সামনে আর যাওয়া যাবেনা ভেবেই আমরা ই-বাইক রেখে হেঁটে সামনের দিকে এগুতে লাগলাম। পায়ের পাতা ডুবিয়ে জলরাশি প্রবাহিত ওই জায়গাটুকু পার হলাম। এরমধ্যে দেখলাম এক মহিলা ঠিক অন্তর বয়সী একটা বাচ্চা মেয়েকে পিছনে বসিয়ে ওই উপচে পড়া পানির মধ্য দিয়ে ই-বাইক চালিয়ে পার হয়ে আমাদের পাশ ঘেঁষে অতিক্রম করে যাচ্ছে। আমাদের দেখে উনিও একটু অবাক হলেন এবং আমাদের প্রসঙ্গে ফিসফিস করে কিছু একটা বলছে সেটাও বুঝলাম। বাচ্চা সহ মহিলাকে দেখেই ভাবলাম সামনে গেলেই হয়ত ওদের বসবাসের স্থান মিলবে। ঠিক তাই। আমরা অল্প দূরত্ব হেঁটেই কতগুলো বাড়ির দেখা পেলাম। তবে বাড়িগুলো বেশ পুরাতন এবং মানুষ বসবাসের অনুপযোগী মনে হল। ওই পরিত্যক্ত বাড়িগুলোর চত্বরে আমাদের পা পড়তেই হঠাৎ একটি কুকুর ঘেউঘেউ করে তেড়ে এল। অন্ত ভয়ে থতমত খেয়ে আমার কাছে দৌড়ে এল। কিন্তু পরক্ষনেই বাড়ি থেকে একজন বৃদ্ধা বের হয়ে কুকুরকে থামাল। আমাদের দেখে বৃদ্ধা ও একটু চমকে গেল। ভিনদেশী মানুষ এমন বিচ্ছিন্ন এলাকায় ওনার চমকানোটায় স্বাভাবিক। তবে সাথে অন্ত থাকায় বৃদ্ধার মুখে বেশ হাঁসি দেখতে পেলাম। অন্ত সহ আমাদের ইঙ্গিত করে উনি কি সব বলছিলেন। অন্ত সাথে থাকলে আমরা চীনাদের কাছে খুব সহজেই আপন হয়ে যাই। শুধুমাত্র অন্তকে দেখেই ওই বৃদ্ধার মত অনেকে অপরিচিত চীনারা আমাদের সাথে যেচে কথা বলতে আসে।

বৃদ্ধার কাছে যেতেই দেখি ঘরের ভিতর থেকে সেই বাচ্চাটা উঁকি দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে সে ও তার মা ঘর থেকে বের হয়ে আসল। মনে হল আমাদের দেখে ওরা বেশ খুশি। মোবাইলের সাহায্যে চীনা ভাষায় ট্রান্সলেট করে নিজেদের পরিচয় এবং আসার উদ্দেশ্য ওনাদের জানালাম। সেইসাথে ওনাদের বললাম 'আমরা চীনা ভাষা পারিনা তবে যদি কারো উইচ্যাটে (চীনাদের সর্বাধিক সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম) সংযুক্ত হতে পারতাম তাহলে আমাদের কথোপকথনে বেশ সুবিধা হত'। আমার কথামত মেয়েটির মায়ের মোবাইলের উইচ্যাটে আমাকে এড করল। বাচ্চাটি দৌড়ে গিয়ে একে একে কয়েকটি টুল বের করে দিল আমাদের বসার জন্য। তম্মধ্যে অন্তর সাথে তার বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। বাচ্চারা বড়দের চেয়ে ও দ্রুত একে অপরের খুব আপন হয়ে যায়। অচেনা মানুষকে অন্তর বন্ধু বানানো থেকে বিষয়টা আরও ভালভাবে বুঝতে পারি। অন্তর বলতে পারা আধোআধো চীনা ভাষার দক্ষতায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় এমন বহু চীনা বন্ধু ও তৈরি করেছে। আমি ওনাদের বসবাসের এরিয়াটা ঘুরে দেখানোর অনুরোধ করলাম। আমার কথায় ওনারা খুব উৎফুল্লের সাথে চারদিকে ঘুরে দেখাল। পরিবারটির এরিয়া বেশ বড়। প্রবেশ পথে দেখা

পরিত্যাক্ত ঘরগুলো এবং ওনাদের বসবাসের ঘরগুলো ছাড়া পরিবারটির আশপাশে তেমন কোন বাড়ি-ঘর দেখলাম না। তাই ওনাদের কাছে প্রথম জিজ্ঞাসা করলাম আশপাশে আর কেউ থাকে কিনা। ওনারা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল আশপাশে বহু পরিবার আছে। কিন্তু সবাই একরকম বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে। অর্থাৎ এক একটি পরিবার একে অপরের থেকে বেশ দূরে অন্তত পক্ষে পায়ে হেঁটে ৪-৫ মিনিটের পথ। আবার কোথাও কোথাও কাছাকাছি বসবাস করে এমন পরিবার ও নাকি আছে।

ওনাদের অনুমতি সাপেক্ষে আমরা আশপাশটা একটু ঘুরে দেখলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল ওদের ওখানে সার্বিক সুবিধাদি যেমন সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ, পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে। আছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মাথার উপরে কয়েকটি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা তেমনটাই জানান দিচ্ছিল। পাশেই পৃথক পৃথক ভাবে হাঁস মুরগির খামার দেখলাম। সেখানে চরে বেড়াচ্ছে প্রায় শ'খানেক করে হাঁস মুরগি। পাশেই দেখলাম সবজি ক্ষেতের পরিচর্যা করছে একজন বয়স্ক মানুষ। উনি যে বৃদ্ধার স্বামী সেটা সহজেই বুঝলাম। পাহাড়ের উপর অর্থাৎ সমতল ভূমি থেকেও বহু উপরে সবজি যে এত সুন্দর ফলন হতে পারে তা আমার আগে থেকে কখনো ধারণা ছিলনা। ভিন্ন ভিন্ন রকমের সবজি লক্ষ্য করলাম সেখানে। নিজেদের পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে এসব সবজির বেশির ভাগটাই ওনারা বাজারে বিক্রি করেন। এর পরের স্থানটা আমাদের অনেক বেশি চমকে দিয়েছিল। দেখলাম সারি সারি মৌমাছির বক্স। এসব বক্সের প্রায় প্রতিটাতে মৌমাছির আনাগোনা সহজে বুঝিয়ে দিল এই মৌমাছির ফার্ম থেকেও ওনাদের পারিবারিক আয়ের একটা বড় অংশ আসে। তার সাথে হাঁস-মুরগি খামার, সবজি বাগান, বাইরে দিনমজুর থেকে আয় করা অর্থ দিয়েই ভালোভাবেই চলে যায় পরিবারটির খরচ।

ওনারা বহু আগে থেকেই ওখানে বসবাস করছে। আগে কষ্ট হলেও বর্তমানে পরিবারটিতে বিদ্যুতের সু-ব্যবস্থা থাকায় এখন অনেক সুবিধা ভোগ করে, যেমনঃ বিদ্যুতের চুলায় রান্না, টিভি, ফ্রিজারের ব্যবস্থা দেখলাম। বাড়িতে একটা মিনি ডিশ লাইনের ব্যবস্থা ও আছে। মাটির দেওয়াল বিশিষ্ট ঘরগুলো এক রকমের ভিন্ন ধরনের টালি দিয়ে ছাওয়া। তীব্র গরম ও ঠান্ডার হাত থেকে একটু উপশম পাওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের পোর্টেবল ফ্যান ও রুম হিটারের ব্যবস্থা আছে প্রতিটি ঘরে। আশপাশে স্কুল কলেজ আছে কিনা জানতে চাইলে বলল, আমরা যে পথ দিয়ে এসেছি ঐ পথেই বাচ্চাদের কিন্ডারগার্টেন সহ, প্রাইমারী স্কুল আছে। হাইস্কুল ও কলেজ একটু দূরে। আগে বাচ্চাদের পড়ালেখার জন্য বেশ সমস্যা হত। স্কুল-কলেজে ঠিকমত পাঠাতে পারত না। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় অনেক দূর হয়ে যেত। কিন্তু এখন পিচঢালা রাস্তা থাকায় কোন সমস্যাই হয় না। বাচ্চার খেলার সাথীর ব্যাপারে ওনারা জানাল, বাচ্চা স্কুলেই বেশি খেলে। এখানে ওর তেমন খেলার জায়গা নেই। তাছাড়া বাচ্চাকে নিয়ে ওনারা মাঝেমধ্যে শহরের বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে ছুটির দিনে ঘুরতে যায়।

চীনা মহিলারা পুরুষের সমান তালে ঘরে বাইরের সকল কাজে পারদর্শী। এই পরিবারটির ভিতরেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পরিবারের সবাই নিজ নিজ কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকে। বাড়ির কর্তা অর্থাৎ বাচ্চা মেয়েটির বাবা খুব সকালে কাজে বেরিয়ে যায় আর বিকেলে ফেরে। মেয়েটির মা ও সকালে মেয়েটিকে স্কুলে দিয়ে কাজে যান। দু'জনেই দিনমজুরের কাজ করেন। বাচ্চাটির দুপুরের খাবার স্কুলেই দেয়। ওর মা-বাবা যেখানে কাজ করেন ওনারাই দুপুরের খাবার সরবারাহ করে। সারাদিন বাড়ি থাকে বয়স্ক সদস্য দুইজন। কিন্তু ওনারা বাড়ির সার্বিক কাজ, যেমনঃ সবজির ক্ষেত, হাস-মুরগির খামার, মৌমাছির ফার্ম দেখাশুনা করে। কখনো মেয়েটির মা বা কখনো বাবা কাজ থেকে ফেরার সময়ে মেয়েকে স্কুল হতে বাসায় নিয়ে আসে। সন্ধ্যায় সবাই একসাথে রাতের খাবার খায়। বেশির ভাগ সপ্তাহের ছুটির দিনে শহরে যায় এবং বাচ্চাটিকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে সন্ধ্যায় বাইরে ডিনার সেরেই তবে বাড়ি ফেরে। সাথে করে বাড়ির বয়স্ক দুইজনের জন্য রাতের খাবার নিয়ে আসে। প্রতিদিন রাতে একসাথে সবাই টিভি দেখে এরপর ঘুমায়। গল্পে গল্পে জানতে পারলাম ওই দম্পতির একটা

ছেলে আছে। সে অন্য প্রদেশের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির পুরো সময়টাই সে বাড়ি কাটায়। সব কিছু দেখে এটাই মনে হল, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় শহর থেকে বেশ দূরে পাহাড়ি পরিবেশে বেড়ে ওঠা এসব শিশুরা শহর থেকে কোন অংশে বিচ্ছিন্ন না। আরও বেশি অবাক করল ওদের একটি ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ে শুনে। পাশে পরিত্যাক্ত ঘরগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, সেখানে ও তাদের মত একটি পরিবার ছিল। পরিবারটি বছর খানিক হল শহরে স্থানান্তরিত হয়েছে। এসব পাহাড়ি জনগণকে চীনের সরকার প্রতিনিয়ত শহরে নির্মিত অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট বাসায় স্থানান্তর করে। এই বিষয়টি আমার আগে থেকেই জানা ছিল। কেননা, আমাদের বসবাসের দুই রুমের ফ্ল্যাটটিও বাসার মালিক নিজেই সরকারের থেকে পেয়েছিলেন। ওনারা জানান দিল ওনারা ও খুব অল্পদিনের ভিতর শহরে চলে যাবে। ওনাদের আশাপাশের বহু পরিবার শহরে চলে গেছে। আরও বলল যদি সরকার বাসা দেয় তাহলে ওনাদের দৈনন্দিন জীবন চালাতে কোন কষ্টই হবে না।

ওদের ওখানে কি কি সমস্যা সেগুলো জিজ্ঞাসা করলে একটি বিষয়কে ইঙ্গিত করেছিল। ভারী বর্ষা হলে ওদের গ্রামটি নাকি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যে নড়বড়ে পথ ধরে আমরা ওদের লোকালয়ে পৌঁছেছিলাম, ভারী বর্ষায় ঐ রাস্তাটির উপর দিয়ে প্রচন্ড বেগে পানি প্রবাহিত হয় এবং খুব বেশি স্রোত থাকে। পূর্বে এমন ও হয়েছে ঐ সময়ে তারা একটানা ৮-১০ দিন পর্যন্ত ওদের গ্রামের বাইরে যেতে পারেনি। বাইরে কাজে যাওয়া, বাচ্চার স্কুলে যাওয়া থেকে শুরু করে বেশ কিছু কাজ সে সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। তাই আবহাওয়ার পূর্বাভাষে ভারী বর্ষণের সম্ভবনা থাকলেই পূর্ব সতর্কতা স্বরূপ আগে থেকেই নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জোগান নিশ্চিত করে রাখে। ওদের বসত ভিটাটি সমতল ভূমি থেকে বেশ উঁচুতে অবস্থিত। আর ওই ভিটার পাশ দিয়েই বয়ে গেছে পাহাড়ের ভিতর থেকে নেমে আসা পাহাড়ি নদী। বেশির ভাগ সময়ে নদীটিতে স্রোত থাকেনা বললেই চলে তবে ভারী বর্ষণে খুবই ভয়ঙ্কর রূপ নেই ওই নদীটি। পানি প্রবাহের বেশ গর্জন ও শোনা যায় নাকি সে সময়ে।

আশপাশের পরিবারগুলোর অবস্থা ও সামান্য হেরফের হয়ে ঠিক ওই পরিবারটির মতই। সামান্য কিছু অসুবিধা ছাড়া অন্য সকল সাধারণ জনগণের মতই বসবাস করে চীনের এসব পাহাড়ি পরিবারগুলো। এসব পরিবারগুলোর সাথে আমাদের দেশের পাহাড়ি জনগণের দৈনন্দিন জীবনে বেশ ফারাক রয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় একবার সুযোগ হয়েছিল বান্দরবানের নাইক্ষংছড়ি উপজেলা ভ্রমণের। উপজেলাটির একটি সেমিনার উপলক্ষে আমরা সাইন্স ল্যাবের একটি টিম গিয়েছিলাম। উপজেলা চত্বর থেকে অল্প হাঁটা দূরত্বে বসবাসকৃত কয়েকটি পাহাড়ি পরিবারের কথা এখনো সুস্পষ্ট মনে পড়ে। খুব কাছ থেকে স্বচক্ষে দেখেছিলাম ওইসব পাহাড়ি পরিবারগুলো ছোট ছোট মাটির ঘরে পরিবারের সকল সদস্যরা একসাথে বসবাস করে আসছে। পরিবারের সদস্যদের অনেকের জরাজীর্ণ চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছিল তারা নানান প্রতিকুলতার মধ্যে টিকে আছে।

পাহাড়ি এসব জনগণের বেশ কষ্টসাধ্য জীবন মাঝেমধ্যে নিজেকে ভাবিয়ে তোলে। সকলের জীবনে হয়ত সার্বিক সুবিধাদি জোটেনা কিন্তু তার মধ্যেও জীবন টিকে থাকে। যে টিকে থাকার মধ্যেও তারা স্বপ্ন দেখে হয়ত বংশ পরম্পরায় তাদের দুঃখ কষ্ট লাঘব হবে। আর সে উদ্দেশ্যেই শত কষ্টে পরিবারের সন্তানকে শিক্ষিত করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। কেননা, উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে যথাযথ জ্ঞান অর্জনই একটা পরিবারকে আলোর মুখ দেখাতে পারে।

চীনের ওই পাহাড়ি পরিবারটি আধুনিক কিছু সুবিধা ভোগ করলেও তাদের ভিতর তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাদের ছেলে পড়ালেখার শেষ করে চাকুরী করলে নিজেরা আরও বেশি আধুনিক সুবিধা পাবে। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা হয়ত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অনেক বেশি সহায়ক হয় কিন্তু কষ্টে অর্জিত সবকিছুর মধ্যে একটা অন্যরকম অনুভূতি কাজ করে। যখন কোন গরিব, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের একটি ছেলে বা মেয়ে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা সহ সকল ক্ষেত্রে সবাইকে ছাড়িয়ে যায় ঠিক সেই খবরগুলোই সবসময় পত্রিকার শিরোনাম হয়। আমরা আশাবাদী সময়ের সাথে সাথে দেশের যেমন উন্নতি হচ্ছে ঠিক তেমনই আমাদের পাহাড়ি বিচ্ছিন্ন সকল পরিবারগুলো সার্বিক সুযোগ সুবিধা পেয়ে সকলের সাথে এগিয়ে যাবে। দেশের বৃহৎ এই জনগোষ্ঠী আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি সকলের সমকক্ষে তারাও স্থান করে নেবে। এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

লেখক :
গবেষক, ফুজিয়ান এগ্রিকালচার এন্ড ফরেস্ট্রি ইউনিভার্সিটি,
ফুজো, ফুজিয়ান, চীন।

চীনের গবেষণা বান্ধব পড়াশোনা এবং আমার মাস্টার্স এর প্রথম কনফারেন্স পেপার: কিছু কথা

মোঃ সাকিব উল্লাহ সৌরভ

আমি মোঃ সাকিব উল্লাহ সৌরভ, চীনের শেনদং প্রভিন্স এর শেনদং ইউনিভার্সিটি অব ফিনান্স অন্ড ইকনোমিকস (SDUFE) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভিন্সিয়াল গভর্ণমেন্ট স্কলার্শিপ নিয়ে মাস্টার্স করছি ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর। আমার ক্লাস শুরু হয় ২০২০ এর সেপ্টেম্বর থেকে এবং এর ২ মাস পরই নভেম্বরে আমার সুপারভাইজারের সাথে আমার পরিচয় হয়। শুরু থেকেই এবং এখন পর্যন্ত উনি আমার প্রতি বেশ আন্তরিক, সহানুভূতিশীল এবং বন্ধুসুলভ আচরণ করছেন। আমার চীনে মাস্টার্স জীবনের একটি ঘটনা আজকে শেয়ার করতে চাচ্ছি আমার এই লিখার মাধ্যমে।

২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে একটা ইন্টার্নেশনাল কনফারেন্সে (ICICIP 2021) আমার মাস্টার্স এর প্রথম পেপার বের হয়। এই পেপারটির কাজ মূলত আমি করি আমার সেকেন্ড সেমিস্টারের একটি কোর্স যেটির নাম "ম্যানেজমেন্ট এম্পিরিক্যাল রিসার্চ", এই কোর্সের অধীন একটি টার্ম পেপারের উপর। এই কোর্সে আমাদের শেখানো হয় কিভাবে সার্ভের মাধ্যমে ডাটা সংগ্রহ করে এসপিএসএস (SPSS) সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডাটা ম্যানিপুলেট করে একটি সিদ্ধান্ত দেখাতে হয়। আমার এই পেপারটির মূল কাজ ছিল কোভিডজনিত ডিপ্রেশন সমাধানে সোশ্যাল মিডিয়ার ইনফর্মেশন সোর্স হিসেবে কী ভূমিকা রয়েছে এবং এক্ষেত্রে আত্মকার্যকারিতার ভূমিকা কতটুকু? - তা নিয়ে একটা সম্পর্ক স্থাপন করা। টার্ম পেপার সাবমিট করার পর সেমিস্টার শেষে কোর্স ইন্সট্রাক্টর বেশ প্রশংসা করেন আমার পেপারটি এবং এর রেজাল্ট নিয়ে। তখন আমি চিন্তা করছিলাম, আমার কাজটা তো বেশ ভালো হয়েছে, এর উপর যদি একটি পেপার করা যায় তবে কেমন হয়? সুপারভাইজারের সাথে বিষয়টা শেয়ার করলাম এবং তিনি সাথে সাথেই আমাকে উৎসাহ দিলেন এবং একটি কনফারেন্সে পেপারটি সাবমিট করার জন্য গাইড লাইন দিলেন তৎক্ষণাৎ। ডেডলাইনের মাত্র তিনদিন আগে আমি পেপারটি সাবমিট করি এবং পরবর্তীতে ছয় মাসের একটা টাইম ফ্রেম শেষে পেপারটি আইট্রিপলই

এক্সপ্লোর (IEEE Explore) এ পাবলিশ হয়। আমার সুপারভাইজার থেকে কথায় কথায় জানতে পারলাম আমার ইউনিভার্সিটিতে ইন্টার্নেশনাল স্টুডেন্সদের মধ্যে আমিই প্রথম যে কিনা কোন আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে রিসার্চ পেপার পাবলিশ করেছে! এখানে উল্লেখ্য, চীনে আমার ইউনিভার্সিটি (SDUFE) বেশ পুরনো এবং স্বনামধন্য হলেও এখানে ইন্টার্নেশনাল স্টুডেন্স নেয়া হচ্ছে ২০১৭ সাল থেকে, মূলত মাস্টার্স এবং পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য। সেই হিসেবে আমি হচ্ছি চতুর্থ ব্যাচের স্টুডেন্ট। আমার প্রফেসর যখন ইউনিভার্সিটির লিডারের সাথে আমার কনফারেন্স রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে কথা বলতে যায়, তখন সে এই বিষয়টি অবগত হয় যে বিষয়টি আমার মাধ্যমে প্রথম হল। এখানে আরো একটি ব্যাপার বলাবাহুল্য। কনফারেন্স রেজিস্ট্রেশন ফি ছিল ৫০০ ডলার যা প্রায় বাংলাদেশি টাকায় ৫০ হাজার টাকার মত। তখন পর্যন্ত আমার এমন পূর্বধারণা ছিল না একটি কনফারেন্স পেপারের রেজিস্ট্রেশন ফি এত বেশি হতে পারে। যাই হোক, আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্টুডেন্টদের পেপার পাবলিকেশনের জন্য সাধারনত এত বেশি পরিমাণ টাকা স্পন্সর করতে দেখা যায় না। কারণ আমাদের বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো সেভাবে গবেষণা বান্ধব হয়ে ওঠেনি! প্রাচীনকাল থেকে দেশ কাল ভেদে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার মুল ধারণাটি এসেছে একটি ভালো চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের স্থান হিসেবেই, তবে সময়ের সাথে সাথে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আধুনিকায়ন করেছে এবং পুঁথিগত পড়াশোনার পাশাপাশি গবেষণার চর্চাটাও সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছে! তারই ফলশ্রুতিতে তারা উন্নত প্রযুক্তির ধারক ও কর্ণধার হয়েছে!

কোন প্রজেক্ট অথবা রিসার্চ যত ছোটই হোক না কেন যদি সেটা ইউনিক কিছু হয় তবে সেটি সায়েন্টিফিক পেপার পাবলিকেশন এর জন্য উপযুক্ত হতে পারে এবং পাবলিশ করার চেষ্টা করা উচিত। আমরা অনেক সময় হয়তো এমন কিছু টিভি নিউজে অথবা ইউটিউবে দেখে থাকি যে তরুণ উদ্যোক্তারা নিজে থেকে চেষ্টা করে অনেক কিছু ইনোভেশন করেছে, যেমন ড্রোন বানানো, বাসা বাড়িতে কাজের উপযুক্ত কোন রোবট তৈরি ইত্যাদি। খেয়াল করে দেখুন, তাদের এই কাজ রিকগনিশন পাবে অথবা সাইন্টিফিক সোসাইটিতে তখনই কন্ট্রিবিউট করবে যদি ভালো কোন কনফারেন্স অথবা জার্নালে সেটার উপর কোন রিসার্চ পেপার পাবলিশ করা থাকে।

বর্তমান পৃথিবীতে সব কিছুর জন্যই কমিউনিকেশন স্কিল এবং অর্থ দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এই তরুণ উদ্যোক্তাটিই যদি সঠিক জায়গায় থাকতেন যেমন -রিসার্চ ফান্ডিং করে এমন কোন ইউনিভার্সিটিতে অথবা কোন গবেষণা ইনস্টিটিউটে গবেষক হিসেবে থাকতেন, তাহলে তার এই ইনোভেশনটি বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাতকরণে কিংবা সাইন্টিফিক কোন জার্নালে পাবলিকেশনে তার নিজস্ব ইনস্টিটিউশন থেকে সহযোগিতা পেতেন। যেটি এই মুহূর্তে তার একা করা সম্ভব নয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। এই কারণে রিসার্চার/গবেষক হিসেবে প্রাথমিকভাবে ক্যারিয়ার গঠনের জন্য এবং নিজের কাজগুলো প্রকাশের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কোনো এফিলিয়েটেড পজিশন এ যেমন - কোন ইউনিভার্সিটি অথবা সাইন্টিফিক ল্যাব এ রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট/ রিসার্চ সাইন্টিস্ট / ইনভেস্টিগেটর হিসেবে জায়গা করে নিতে হবে, এর বিকল্প নেই। আমাদের দেশে দুঃখজনকভাবে এই সংস্কৃতি এখনো গড়ে ওঠেনি। উল্লেখযোগ্যভাবে বলার মতো তেমন কোনো গবেষণা এখানে হয় না এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত পণ্যের জন্য আমাদের অন্যান্য উন্নত দেশের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। ওখানে cutting-edge গবেষণাগুলো হয় এবং সেগুলো যখন প্রোডাক্ট হিসেবে বাজারজাত করা হয়, তখন সেই প্রযুক্তি পণ্যগুলো আমরা ক্রয় করি। অথচ এই ধরনের গবেষণাগুলো আমাদের দেশে যদি হত তাহলে আমরাও আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হতাম। আমাদের দেশ, এবং দেশের মানুষ এই বিষয়টা বুঝতে না পারলেও চীনের সরকার ঠিকই বুঝেছে। চাইনিজরা আমাদের মত থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে মেধাবী

মানুষগুলোকে তাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বৃত্তি দিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের ইন্টেলেকচুয়াল এক্সপ্লোরেশনটা বাইরের ওয়ার্ল্ডে বাড়াচ্ছে, যেটি তাদের একক ভাবে করা বেশ কষ্টের ব্যাপার। সারাবিশ্বে তারা তাদের নিজেদের জাতির লোকদের বিভিন্ন পজিশনে পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং এটি তাদের জন্য ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ লবিং হিসেবে কাজ করবে। তারা ইংরেজিতে খুব একটা বেশি সময় ব্যয় করছে না জাতিগতভাবে বরং সে জায়গায় তারা কোলাবোরেশন করে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের তাদের দেশে নিয়ে আসছে এবং তাদের গবেষণার, শিক্ষার, অর্থনীতির এবং অন্য সবকিছুর এক্সপোজার বাড়াচ্ছে তাদের মাধ্যমে। সময়োপযোগী এবং সঠিক জায়গায় মনোযোগ, শ্রম এবং অর্থ বিনিয়োগ করার এই যে একটি মানসিকতা এটি তাদের অনেক এগিয়ে দিচ্ছে বাকিদের চেয়ে।

মৌলিক গবেষণাতেও চীন এখন বেশ মনোযোগ দিয়েছে! এর উদাহরণ হচ্ছে মঙ্গলে চীনের যান যুরং পাঠানো। এটি মঙ্গল গ্রহে ৯০ দিন অতিবাহিত করেছে এবং ৪৪০ গিগাবাইট ডাটা পাঠিয়েছে! যার ফলে মঙ্গল গ্রহের অনেক গুরুত্বপূর্ন ডাটা এখন চীনের কাছে! চিন্তা করছিলাম চীনে আমার মাস্টার্স জীবনে আমার কি কি অর্জন হলো এখন পর্যন্ত। খেয়াল করে দেখলাম প্রথম তিন সেমিস্টার এ প্রত্যেকটিতেই আমার কিছু-না-কিছু শর্ট স্টেপ রয়েছে, যেমন প্রথম সেমিস্টারের একটি কনফারেন্স এ আমার গ্রুপের পক্ষ থেকে পেপার প্রেজেন্টেশন করেছি, দ্বিতীয় সেমিস্টারে একটি কনফারেন্স পেপারের ডাটা কালেক্ট করেছি যেটি থার্ড সেমিস্টার এ গিয়ে একটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স এ কনফারেন্স পেপার হিসেবে পাবলিশ করেছি। এরপর আসলো থার্ড সেমিস্টার, এখানে চীনে আমার ইউনিভার্সিটি যেই প্রভিন্সে সেখানে একটি শীর্ষস্থানীয় সফটওয়্যার ইনোভেশন কম্পিটিশনে প্রথম পুরস্কার (সব মিলিয়ে তৃতীয়) পেয়েছি সর্বমোট তিনশত ষাটটি দলের মধ্যে এবং এই প্রজেক্ট টির উপরে একটি জার্নাল পেপার স্বনামধন্য একটি জার্নালে (Springer) একসেপ্ট হয়েছে পাবলিকেশন এর জন্য।

এই সবকিছুই সম্ভব হয়েছে চীনের গবেষণাবান্ধব শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের আন্তরিক ব্যবহার ও সহযোগিতার জন্য। সবমিলিয়ে বেশ ভালো এবং স্যাটিসফেক্টরি আমার নিজের কাছে এখন পর্যন্ত চীনে পড়াশোনার অভিজ্ঞতা। বাকিটা সময় হয়তো বলে দিবে। পরিশেষে, প্রত্যাশা এই থাকবে যে, আমার নিজের দেশেও হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও একইভাবে গবেষণাতে জোর দেয়া হবে, সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে এবং টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াবো! কারণ মেধার অভাব আমাদের কখনোই ছিল না!

লেখক :
মাস্টার্স শিক্ষার্থী, ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
শেনদং ইউনিভার্সিটি অব ফিনান্স অন্ড ইকনোমিকস, জিনান, চীন।

কবিতা

খোঁজ

আবু সাঈদ

আমি খুঁজেছি তোমায় বারেবার
পাহাড়ি পথে নেমেছে আঁধার
আমি শুনেছি সেথায় শোরগোল
তুমি ছিলে কোথায় বল মশগুল!

হেঁটেছি তবু আমি সামনের দিকে
হয়েছে দিগন্ত যেথায় ফিকে
আবারো আমি খুঁজেছি তোমায়
গাছেগাছে তখন পাখিরা ঘুমায়।

ফিরেছি তবু আমি শূন্য হাতে
আসলাম যেরূপ এ ধরাতে!

ভুলিনি যেতে তোমায় ঐ রাস্তা দিয়ে
অধীর আগ্রহে আকাশে চেয়ে চেয়ে
পেয়েছি সৃষ্টির মাঝে পরশ তোমার
জীবনটা হল আমার রঙের বাহার!

যাব বা যাব না খুঁজতে তোমায়
হারাবো না নিজেকে কিছুর ছোঁয়ায়।
থাকুক আছে যা কিছু ছন্দের মত
আমার জীবনও যাবে ছাঁচের মত!

কবি :
স্নাতক শিক্ষার্থী,
চাংশা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চাংশা, হুনান, চীন।

ছোট্ট বাঘ

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম

ছোট্ট বাঘ ছানাটি তিড়িং বিড়িং লেজ নাড়িয়ে খেলে,
পেটটি ভরা থাকলে সে যে চলে হেলে দুলে।
দুষ্টুমি সে করতে জানে আপন মনে চলে,
একটু ব্যথা পেলেই সে তো মাকে গিয়ে বলে।
ছোট্ট বাঘ ছানাটি মায়ের পাশাপাশি চলে,
সবার ভালোবাসা নেয় যে সে ছলে বলে কৌশলে।
মজার খাবার প্রিয় যে তার লুকোচুরি খেলে,
বুদ্ধিদীপ্ত চলাফেরা বোকার মত নাহি সে তো চলে।
ভয় দেখাতে সেও পারে দেখায় না তো ভয়,
ভালোবাসা দিয়ে নাকি সে করবে সব জয়।

কবি :
কুইজৌ, চীন।

কবিতা

"শহুরে প্রকৃতি"

শিরিন আক্তার

আচ্ছা! বিলের ধারে ঝিলের পাশে সেই মাঁদার গাছ টা কি এখনও আছে!

যার মগ ডালে বসে প্রতিদিন দুটো শালিক পাখি খুনশুটি করতো।

আর সেই লম্বা আকাশ ছোঁয়া তাল গাছটা, যার আগায় ছিলো অফুরান্ত বাবুই পাখির বাসা।

বাড়ির অদূরে বাবুদের আম বাগান টা কি এখনও আছে?

ভোর রাতে আম কুড়ানোর উত্তেজনায় ঘুমটা হতো না যে।।

শুনতাম রাতের বেলা সেখানে পুকুর পাড়ে ভুঁতেরা কাপড় কাঁচে।

মা বলতো ওখানে যাসনে খুকি আম কুড়াতে।

কে শোনে কার কথা, চাঁদনী রাতে চুপি চুপি চলে যেতাম দলেবলে।

আচ্ছা! গোধূলি লগ্নে গাঁয়ের রাখাল ছেলেটা কি এখনো বাঁশি বাজিয়ে ঘরে ফেরে, আজানের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে যেতো যে অজপাড়া গায়ে।।

শুনেছি সে বিল ভোরে গেছে লোনা জলে, তাল গাছ হারিয়ে গেছে সময়ের স্রোতে।

হয়তো শালিক পাখি এখনও আসে, তবে মাদার গাছ টা!

বাবুই, সেতো বিলুপ্ত প্রায়!

সেদিনের সেই রাখাল বালক, জিবীকার সন্ধানে গ্রাম ছেড়েছে ঠিকি, কিন্তু বাঁশি বাজানো ভোলেনি।

শুধু সময়টা আর হয়ে ওঠে না তার এই ব্যস্ত শহরের যাতাকলে।।

আচ্ছা! নানাবাড়ির উঠানের সেই শিউলি গাছটা? কিংবা মসজিদে পাশের সেই বকুল গাছটা কি আছে?

প্রতিদিন ভোরে মালা গেঁথে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার দিন টা বোধহয় আর কোনদিন ফিরবে না!

প্রকৃতি আছে আগের জায়গায় শুধু ভাবটা আজ শহুরে,

আর মানুষ গুলো নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার নেশায় মত্ত এই ব্যস্ত জনজীবনে ।।

কবি :
পিএইচডি শিক্ষার্থী
চাইনীজ একাডেমি অব এগ্রিকালচারাল সাইন্স, হাংজু, জেজিয়াং, চীন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান

মীর আব্দুর রব

(১) আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিকের দিকে একটু নজর দিলে দেখতে পাবো যে, পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে খুব দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আবার হঠাৎ গায়ে ব্যাথা ভাব বা জ্বর জ্বর অনুভব হচ্ছে অমনি আমরা কাছের কোন ফার্মেসি থেকে ঔষধ এনে খেয়ে নিচ্ছি। বর্তমানে করোনা মহামারী কালীন সময়ে লকডাউনের প্রভাবে যেকোন স্বাস্থ্য পরামর্শের জন্য অনলাইনে আমরা চিকিৎসকের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করছি। শুধু মাত্র সুস্থ থাকার জন্য আজ আমরা হাতের কাছে খুব দ্রুত যে স্বাস্থ্য সেবা গুলো পাচ্ছি তা অতীতে এতোটা সহজ ছিল না।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজকের আধুনিকায়ন কিন্তু এক দিনে বা এক বছরেও সম্ভব হয়নি এর অগ্রগতি সম্পূর্ণ হয়েছে ধাপে ধাপে, এখনো বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস অতি প্রাচীন, প্রায় তিন হাজার বছর আগে মিশর, ভারত, গ্রিস ও রোমে চিকিৎসা বিদ্যার বীজ রোপিত হয়েছিলো। এছাড়াও চীনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। প্রাচীন চীনা চিকিৎসা বিদ্যা মূলত তাওবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্র "হুয়াং দি নিজিং " থেকে হেরাল মেডিসিন, আকুপাংচার, ম্যাসেজ, থেরাপি সহ বিভিন্ন ধরনের ঔষধ সম্পর্কে জানা যায়।

আগেকার দিনে মানুষ নানা রকম কুসংস্কারের বিশ্বাস করত। রোগীর চিকিৎসার জন্য জাদু টোনা ইত্যাদির আশ্রয় নিতো কিন্তু কালক্রমে মানুষের চিন্তা ধারার বিবর্তনের ফলে আজ মানুষ এই সকল ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বিভিন্ন মনীষী ও বিখ্যাত চিকিৎসকের প্রচেষ্টায় রসায়ন শাস্ত্রের উন্নয়ন, প্রাণীবিদ্যার প্রসার, এবং অণুজীববিদ্যা ও জেনেটিক্স বিদ্যার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে যার ফলে মানুষ স্বাস্থ্য সেবার অমূল্য অগ্রগতি সাধন হয়েছে। প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রেটিসের হাত ধরে মানুষের রোগ এবং তার চিকিৎসা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা বেড়েছে। তিল তিল করে জ্ঞানের পাহাড় গড়ে তুলেছেন কালজয়ী এবং ভুবনবিখ্যাত চিকিৎসকেরা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম এক বিজ্ঞানী যার কথা না বললেই নয়! তিনি হলেন মহান দার্শনিক ইবনে সিনা। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি বিশ্বজুড়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁর লেখা চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ “আল কানুন ফিত তিব্ব” কে দীর্ঘকাল ইউরোপে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত করা বার্তা সংস্থা ইকনা'র রিপোর্ট: মানবদেহের অঙ্গসংস্থান ও শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে সব তথ্য প্রদান করেছিলেন সেগুলো সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পৃথিবীর সব দেশের চিকিৎসকেরা অনুসরণ করেছিলেন। বলা যায়, শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁর কালজয়ী অবদান উল্লেখযোগ্য। প্রথম এ্যানেস্থেসিয়া ব্যবহার, এন্টিবায়োটিকের উৎপত্তি, স্টেথোস্কোপ, কেমোথেরাপি, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট, প্রেসমেকার ইত্যাদি এসেছে কালে কালে, এরই

ধারাবাহিকতায় বর্তমানে চিকিৎসকের কাজ গুলোকে সহজ করতে এবং সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে কম্পিউটার বিজ্ঞান কে যুক্ত করা হয়েছে। কম্পিউটার বিজ্ঞানের সবচেয়ে আধুনিক এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সফল প্রয়োগ স্বাস্থ্য সেবায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান কে ভবিষ্যতে স্মার্ট মেডিকেল সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (SMST) তে রুপান্তর করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি সেতু হিসেবে কাজ করবে।

(২) প্রতিদিনই নতুন কোন না কোন ঔষধ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চলছে। আবার চিকিৎসা বিজ্ঞান -এ বিভিন্ন পদ্ধতিকে একসাথে করে (Multidisciplinary approach, Hybrid procedure) চিকিৎসা পদ্ধতির সক্ষমতা আরও বাড়িয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে। শুধু চিকিৎসকগণ নয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা, গবেষনা ও চিকিৎসার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত আছেন প্রকৌশলী, ইনফরমেশন টেকনোলজী (IT) বিশেষজ্ঞ, জীববীদ, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, মহামারীবিদ ইত্যাদি নানা পেশার বিশেষজ্ঞ আর কর্মী বাহিনি। তাই এককথায় বলা যায় মানব শরীরের এমন কোন অঙ্গ আর বাকী নেই যেখানকার অসুখ নিরূপন করা অসম্ভব।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান -এ চিকিৎসা সেবা আরও বেশী করে প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বেশ কিছুদিন থেকে শুরু হলেও এর প্রভাব এবং সক্ষমতা ক্রমশই বাড়ছে। আগে যেখানে মনিটরিং, অ্যালার্ম, ফিডব্যাক, ভেন্টিলেটর এবং অন্যান্য কিছু যন্ত্রপাতিতে সীমিত মাত্রায় Artificial intelligence (AI) ব্যবহার করা হতো, এখন সেটা কৃত্রিম রোবট অথবা ড্রোন হিসাবে ব্যবহার করা হবে। নিচে এই শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনাগুলো নিয়ে এখন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

ইন্টারনেট স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (E health system) :

ই-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হলো মোবাইল বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা। এতে অসুস্থ রোগী সহজেই বাড়িতে বসে চিকিৎসা সেবা নিতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের মোবাইল এপ্লিকেশন তৈরী করা হচ্ছে যাতে ড্রপচার্ট থাকবে। ড্রপচার্টের উপর লক্ষন অনুযায়ী ক্লিক করলেই কেস হিস্টরি তৈরি হয়ে যাবে। তাছাড়া শরীরে পরে থাকা গ্যাজেট (Gadget) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে শরীরের পালস, ব্লাড প্রেশার, তাপমাত্রা, শ্বাস-প্রশ্বাস, অক্সিজেন এর মাত্রা, সুগার লেভেল, ইসিজি, ইকো, আল্ট্রাসনোসহ নানাবিধ তথ্য পাওয়া যাবে। চিকিৎসক এসব তথ্যের ভিত্তিতে দূর থেকেও (Telemedicine) চিকিৎসা দিতে পারবেন। রোগের অগ্রগতি সম্বন্ধে জানতে পারবেন, এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা মেসেজ হিসাবে দিয়ে রাখতে পারবেন। চিকিৎসকের ফি দেওয়ার জন্য আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ব্যাংকের হিসাব থেকে তা ট্রান্সফার হয়ে যাবে চিকিৎসকের একাউন্টে। উদাহরণস্বরূপঃ কোন রোগীর হার্টে একটি রিং পরানো হয়েছে। এই রিং টিতে ন্যানোটেকনলজি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই মেশিন টি মূলত IOT(Internet of Things) বেস যুক্ত। প্রধানত এই রিং টি তার কাজ করার পাশাপাশি রোগীর হার্ট এবং হার্ট সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ইনপুট নিয়ে তা ইন্টারনেটর মাধ্যমে তার মোবাইল এপ্লিকেশন সফটওয়্যারে পেরন করবে যার উপর ভিত্তি করে ডক্টর রোগীর সেবা প্রদান করবে।

ই-স্বাস্থ্য ব্যাবস্থা কে আরো উন্নত করতে ইন্টারনেট ক্লাউড কম্পিউটিং সিস্টেম ও IOT (Internet of Things) এর ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ভবিষ্যতে। স্বাস্থ্য সেবা তে IOT হলো এমন একটি শব্দ যা বর্ননা করে, কিভাবে "স্মার্ট" ডিভাইস গুলো কে ইন্টারনেটর সাথে ডেটা শেয়ার করার জন্য পরস্পরকে যুক্ত করা হয়। স্বাস্থ্যসেবা সেটিংসে, IOT-এর মধ্যে রয়েছে বেডসাইড মনিটর, স্মার্টওয়াচ এবং ফিটনেস ট্র্যাকার, ইমপ্লান্ট করা

মেডিকেল ডিভাইস এবং অন্য কোনো ডিভাইস যা স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা সংক্রান্ত ডেটা সম্বলিত একটি সংকেত প্রেরণ বা গ্রহণ করে।আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে IOT ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা নিতে পারি। যেমনঃ

খরচ হ্রাস — IOT সংযোগের ব্যবহার হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের খরচ কমানোর জন্য বর্জ্যের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করতে পারে।

ত্রুটি হ্রাস — যেহেতু IOT সফ্টওয়্যার অনেকগুলি ম্যানুয়াল প্রক্রিয়াগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করে, তাই মানুষের ত্রুটির জন্য কম সুযোগ রয়েছে।

উন্নত রোগীর অভিজ্ঞতা — দীর্ঘ-পরিসরের IOT সংযোগ রোগীদের জন্য তাদের চিকিৎসায় আরও বেশি নিযুক্ত থাকা সহজ করে তোলে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সমস্ত প্রাসঙ্গিক রোগীর ডেটাতে আরও ভাল অ্যাক্সেস রয়েছে।

হসপিটালে ভর্তি এবং রিডমিশন হ্রাস — সর্বদা চালু থাকা IOT সংযোগের মাধ্যমে, রোগীর মনিটরিং রিয়েল-টাইমে করা যেতে পারে, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীরা রোগী কিভাবে কাজ করছে তা ট্র্যাক করতে পারে এবং তাদের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হওয়ার আগে সমস্যা গুলো সনাক্ত করতে পারে।

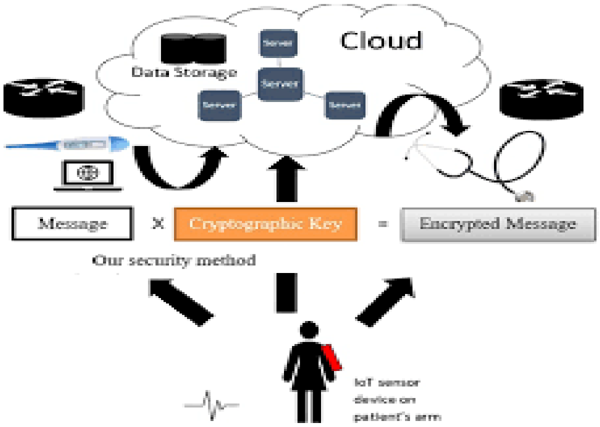

দ্রুত রোগ নির্ণয় — IOT ডিভাইস গুলো নিয়মিত ভাবে ডেটা সংগ্রহ করার ক্ষমতা রাখে এবং এটি সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসকের কাছে তথ্য পেরণ করতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগির গুরুতর লক্ষণ গুলি উপস্থিত হওয়ার আগে রোগ সম্পর্কে চিকিৎসকে অবগত করে।

উন্নত ওষুধ এবং সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা — IOT ওষুধ এবং সরঞ্জাম ট্র্যাকিংকে সহজ করে তোলে, যা প্রদানকারীদের তাদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করা সময় বাঁচাতে দেয়।

এছাড়াও ভোক্তা অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে হাসপাতালের ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবাতে IOT-এর অনেক উত্তেজনাপূর্ণ ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যেমনঃ হাঁপানি এবং সিওপিডি রোগীর ব্যবস্থাপনা, ডায়াবেটিসের উন্নত নিয়ন্ত্রণ, ওষুধের সম্মতি (Medication compliance), রোগীর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ, রোগীদের প্রদানকারী পর্যবেক্ষণ (Provider Monitoring of Patients), প্রবীণ যত্ন এবং স্বাধীনতা, ইনজেস্টেবল সেন্সর, রোবোটিক সার্জারি ইত্যাদি।

এআই/এমএল দিয়ে স্বয়ংক্রিয় চিত্র নির্ণয় (Automated Image Diagnosis with AI/ML) :

বায়োইনিজিনিয়ারিং ক্ষেত্রে ইমেজ প্রসেসিং সিস্টেম মেডিকেল সাইন্সকে আরো আধুনিকায়ন করেছে এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অনেক বড় পরিবর্তন এনেছে। ক্লিনিকাল বিশ্লেষণ ও রোগ সনাক্ত করেন জন্য ইমেজ অ্যানালাইসিস সিস্টেম টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও ফিজিওলজির ডেটাবেজ গুলো সংরক্ষণ এবং মূল্যায়ন এর জন্য ইমেজ প্রসেসিং সিস্টেম একটি অপরিহার্য বিষয়ে পরিনত হয়েছে। এই সিস্টেম এর জন্য চিকিৎসক রোগীর সঠিক ও নির্ভুল সেবা দিতে পারছেন।

প্রথম দিকে রেডিওলজি বিভাগে রিডিওগ্রাফি, ম্যাগনেটিক ইমেজ প্রসেসিং সিস্টেম, আল্ট্রা সাউন্ড সিস্টেম, এন্ডোস্কোপি, থার্মোগ্রাফি, PET ও SPECT ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করে ইমেজ প্রসেসিং করা হতো। বর্তমানে মেশিন লার্নিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে 3D ইমেজ প্রসেসিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে যা আরো নিখুঁত ভাবে অঙ্গ গুলোর অবস্থান ও রোগ নির্ণয় করতে পারে, এতে নিউরাল নেটওয়ার্কিং সিস্টেম ও ইমেজ ডিটেকশন সিস্টেম থাকায় এর শক্তিশালী সেন্সর রোগ গুলো সহজে ডিটেক্ট করতে পারে। বর্তমানে

ভেক্টর গ্রাফিক্স ইমেজ এর মাধ্যমে 3D কালার আল্ট্রাসনোগ্রাফি ও MRI মেশিন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

চর্মরোগ এরজন্য বর্তমানে ইমেজ রিকগনিশন এর মাধ্যমে বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে ক্ষত স্থান এর ফটো তুলে রোগী বাসায় বসে তার রোগ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাচ্ছে ফলে রোগি চিকিৎসক কে তার রোগ সম্পর্কে বুঝাতে ও তার শারীরিক অবস্থা বুঝায় সক্ষম হচ্ছে। বর্তমানে গুগল ও মাইক্রোসফট এর মতো জায়ান্ট রা হেলথ কেয়ার ও বায়ো ইন্জিনিয়ারিং খাতে প্রচুর বিনিয়োগ করছে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে।

রোবোটিক্স সার্জারি (Robotic surgery system) :

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এখন প্রতিটি শিল্পে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে মানবদেহে অস্ত্রোপচারের AI এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য সম্ভবনা তৈরি করেছে। AI টেকনোলজি ব্যবহার করে রোবটের মাধ্যমে নিখুঁত ভাবে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব তবে বাজারে খুব কম রোবোটিক্স সার্জিক্যাল সিস্টেম পাওয়া যায় কিন্তু ভবিষ্যতে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

২০০০ সালে এফডিএ এর অনুমোদন পেয়ে দ্যা ভেঞ্চি সার্জিক্যাল সিস্টেম তৈরি করা হয়েছিলো যা মূলত ইনটুইটিভ সার্জিক্যাল সিস্টেম দ্বারা নির্মিত, তবে বর্তমানে মেশিন লার্নিং ও AI ব্যবহার করে সিস্টেম গুলোর আপডেট করা হচ্ছে। এছাড়াও মাইক্রোস্কোপি সার্জারির জন্য অনেক মাইক্রো রোবোট তৈরী করা হচ্ছে। নিউরোসার্জন ও অর্থোপেডিক সার্জনরা বিশেষায়িত রোবোটিক্স অস্ত্রোপচার পদ্ধতি অনুসরণ করে রোগীদের সুস্থ করার চেষ্টা করছে। এছাড়াও করোনারি আর্টারি বাইপাস, ক্যান্সারের চিকিৎসা, গলব্লাডার অপসারণ, নিতম্ব প্রতিস্থাপন, পাইলোপ্লাস্টি, রেডিকাল প্রোস্টেটেক্টমি, টিউবাল লাইগেশন, হিস্টেরেক্টমি, নেফ্রেক্টমি, মিট্রাল ভালভ মেরামত, পাইলোরোপ্লাস্টি, রেডিকাল সিস্টেক্টমি ইত্যাদি ক্ষেত্রে রোবোটিক্স সার্জারি ব্যবহার করা হচ্ছে ।

রোবোটিক্স সার্জারি সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো, এটিতে কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে যা বিভিন্ন কম্পিউটেশনাল ইউনিট দিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের অনুকরণ করে। এটি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোসেসিং সিস্টেম আছে যা মানুষের সাধারণ ভাষা বুঝতে ও বুঝাতে সক্ষম এবং এর সাথে কম্পিউটার ভিশন যুক্ত থাকায় মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ভিডিও ও ছবি বোঝার ক্ষমতা রাখে।

ছাড়াও রোবোটিক্স সার্জারি তে রোগির স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমিয়ে আনে যেমনঃ

- সার্জন দ্বারা ভাল নির্ভুলতা, নিয়ন্ত্রণ, এবং নমনীয়তা।
- জটিল এবং সূক্ষ্ম পদ্ধতিগুলি সম্পাদন করার জন্য সার্জনের ক্ষমতা যা অন্যান্য পদ্ধতি দ্বারা সঞ্চালন করা কঠিন।
- ন্যূনতম আক্রমণাত্মক অস্ত্রোপচার।
- ছোট ছেদ (কাটা)।
- হাসপাতালে সংক্ষিপ্ত থাকার।
- কম জটিলতা, যেমন অস্ত্রোপচারের জায়গায় সংক্রমণ।
- কম ব্যথা।
- রক্তক্ষরণ কমে যায়।
- দ্রুত পুনরুদ্ধার।
- ছোট, অদৃশ্য দাগ

বর্তমানে এই সেক্টরের এখনো গবেষণা অব্যাহত রয়েছে এবং এর সাথে নতুন নতুন প্রযুক্তির সংযোজন ঘটছে যা চিকিৎসক দের জটিল কাজ গুলো কে সহজ করে দিতে সাহায্য করছে।

(৩) প্রতিনিয়তই নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন হচ্ছে আর এই প্রযুক্তি গুলো সংযুক্ত করা হচ্ছে বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে এরই প্রেক্ষিতে

স্বাস্থ্য ক্ষেত্র কে আর বাহিরে রাখা হয়নি বরং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সহজ করার জন্য হেলকেয়ার সংস্থা বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন বিনিয়োগ করেছে অপরদিকে প্রচুর পরিমাণে গবেষণাও চলছে। বর্তমানে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ছোট বড় সকল ইউনিটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) এর প্রয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে কি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে মানুষের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে? বিষয় টা মোটেও এরকম নয়!

একজন বিশেষজ্ঞের পক্ষেও এত বিশাল পরিমাণ ডাটা কিংবা সেগুলোর সিকোয়েন্স মনে রাখা সম্ভব নয়। এটি কেবল একটি যন্ত্রেরই কাজ। এর দ্বারা এটাই বোঝানো হচ্ছে যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনো একজন বিশেষজ্ঞ কিংবা এখানে কর্মরত কাউকে সরিয়ে দেবে না। বরং তাদের কাজকে সহজতর এবং নির্ভুল করতে সহায়তা করবে।

চিকিৎসা সেবা প্রদানে প্রতি মুহূর্তেই নিত্যনতুন সব বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়, যার ভেতর যথাযথ তথ্যের অভাবে ভুল চিকিৎসা প্রদানের ব্যাপার সামনে নিয়ে আসা যায়। কিংবা একজন রোগীর সব তথ্যই সংগ্রহে রয়েছে, কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নজরের বাইরে চলে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিজেই সবার আলাদা তথ্য সংরক্ষণ করতে পারবে, সেইসাথে একই ধরনের সিকোয়েন্সে ব্যবহারের জন্য কী করা যেতে পারে তার ধারণাও দিতে পারে। যার ফলে চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে এবং তিনি রোগগুলো নিখুঁত ভাবে যাচাই বাছাই করতে পারবেন। যন্ত্রের ব্যবহার ফলে চিকিৎসকের সময়ের অপচয় ও কম হবে।

একটি মেশিন যতই তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারুক না কেন, সেটি কখনো মানবিকভাবে চিন্তার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে না। মেশিন কখনো ভাবতে যাবে না একজন রোগীর আসলে কী প্রয়োজন, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেমন, পরিবারের লোকজনদের কাছে সে কতটা গুরুত্ব বহন করে! এটা একজন মানুষেরই কাজ যে, তার রোগীর মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় আনা। মেশিন সুধুমাত্র চিকিৎসকের সহোযোগি মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

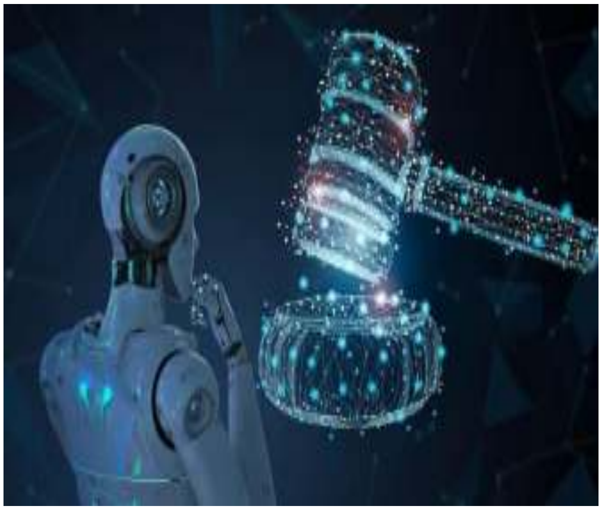

পরিশেষে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ভালো মন্দ উভয় দিক রয়েছে আর এটি নির্ভর করে প্রয়োগের উপর। আর এই প্রয়োগ প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি। বর্তমানে টেকনোলজির যেমন উন্নয়ন হচ্ছে ঠিক তেমনই এর ব্যবহারের খরচ বাড়ছে। তাই নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে বৈষম্য মূলক টেকনোলজি যেন উদ্ভব না হয় এই খেয়াল রাখা খুব জরুরি।

লেখক :
স্নাতক শিক্ষার্থী, ইনফরমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
জিয়ানক্সি ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, জিয়ানক্সি, চীন।

ছয় ঘন্টায় বিশ্ব ভ্রমণ

ফারহানা শুচি

ছয় ঘন্টায় বিশ্ব ভ্রমণ। কথাটা শুনতে কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগছে তাই না! এটা কি আদৌ সম্ভব? কথায় আছে মন থেকে চাইলে পাথরেও নাকি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব! আর এই তো বিশ্বভ্রমণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হয়ত সত্যিই একদিন এই অসম্ভবকেও সম্ভব করে ফেলবে। যাই হোক এবার আসি আসল কথায়, ঘুরতে পছন্দ করে না এমন মানুষের সংখ্যা হয়ত কমই আছে। স্বাদ আর সাধ্যের মাঝে সবাই কম বেশি ঘুরতে ভালবাসে। চীনারাও এর ব্যতিক্রম নয়। চীনারা খুব পরিশ্রমী জাতি কিন্তু কাজের ফাঁকে একটু অবসর পেলেই তারা ছুটে যায় সুন্দর কোন জায়গায় তাদের অবসর কাটাতে। একটানা কাজ কখনও আনন্দ দেয় না। তাই পরিশ্রমের খোলস থেকে বের হয়ে নিজেদের আবার পরবর্তী কাজে উজার করে দিতেই তারা তাদের ছুটি গুলো খুব সুন্দর করে উপভোগ করে থাকে। এটা বললে ভুল হবে না যে, চীনারা ভ্রমণ পিপাসু জাতি। আর তাই যে কোন ছুটির দিনে যে কোন দর্শনীয় স্থানে গেলে দেখা মেলে সকল বয়সী মানুষের। তাদের এই আনন্দ ভ্রমনের মাত্রা বাড়াতে চীনের বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন থিম পার্ক। “উইন্ডো অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড” এমনই একটি থিম পার্ক, যেখানে সারা বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত স্থাপনা, স্থাপত্য, শহর, দালান এবং রাস্তা এমন সুন্দর করে তৈরি করা হয়েছে কখনও কখনও মনে হতেই পারে আপনি সত্যিই বুঝি একই সময়ে সাত মহাদেশে অবস্থান করছেন।

চীনে যাবার আগে একটাই ইচ্ছা ছিল “গ্রেট ওয়াল” দেখতে যেতেই হবে। উইন্ডো অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড এর কথা আমার জানা ছিল না। এক ক্লাসমেটের উইচ্যাট মোমেন্টে দেখলাম, সে আইফেল টাওয়ার, পিরামিড এবং ইন্ডিয়া গেটের সাথে ছবি দিয়েছে। প্রথমে ভাবলাম, সে হয়ত সত্যিই ওসব জায়গাতে ঘুড়ে এসেছে। কয়েক মুহূর্ত পরে দেখলাম, অন্য এক ক্লাসমেটও একই মত প্রায় ছবি দিয়েছে। এবার বুঝলাম এসব আশেপাশে কোথাও আছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম এটা শেনজেনের হ্যাপি ভ্যালির পাশে ৪৮০০০০ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত একটি থিম পার্ক “উইন্ডো অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড”। এটি বিশ্ব-সংস্কৃতির প্রতিপাদ্যকে বহন করে। বিশ্ববিখ্যাত ভূদৃশ্যের প্রতিলিপি, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং লোক রীতি ও লোকগীতি ও নৃত্য উপস্থাপন করে থাকে। এটি পরিবারের সাথে, বিশেষত ছোট বাচ্চাদের সাথে সময় কাটানো জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা। কারণ এটি একই সাথে ভূগোল, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে সক্ষম। কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে সেখানে ঘুড়তে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠছিল না।

অবশেষে চীনের জাতীয় দিবসের ছুটিতে সেখানে যাবার সুযোগ হয়েই গেল। দিনটা ছিল ১ অক্টোবর, ২০১৯। চীনের নববর্ষের ছুটির পর এটিই একমাত্র বড় ছুটি। ভাগ্যক্রমে আমার যাত্রাসঙ্গী হিসাবে পেয়েছিল আমার প্রাণের ক্যাম্পাস বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করে আবার আমার সাথে চায়নার একই ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করতে আসা জুনিয়ার রিয়ন, রূপক

এবং উদয়কে। যেহেতু আমাদের ক্যাম্পাস গুয়াংজুতে আর উইন্ডো অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড হল শেনজেন শহরে তাই খুব সকালে আমরা রওনা দিলাম শেনজেনের উদ্দেশ্যে। আমরা সবাই খুব উত্তেজিত ছিলাম, কারণ এটা ছিল আমাদের সবার প্রথম বুলেট ট্রেনের উঠার অভিজ্ঞতা। ট্রেন কত স্পিডে যাবে? ট্রেনের ভিতর বসে থাকতে কেমন লাগবে? ট্রেনের টিকিট কাটার পর থেকেই এমন জলপনা কল্পনা করে আমাদের দিন কাটছিল। অবশেষে সেই মহেন্দ্রক্ষন চলে এল। গুয়াংজু ইস্ট রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হল। এই রেলওয়ে স্টেশন একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টেশন, কারন এখানে থেকে হংকং এরও ট্রেন যায়, এছাড়া চীনের বিভিন্ন প্রদেশেও এই স্টেশন থেকে যাওয়া যায়। এত বড় আর এত সুন্দর রেল স্টেশন আমি আগে কখনও দেখিনি। এর ভিতরেই রয়েছে আবার সুপার শপ, শপিং মল এবং দেশী বিদেশী রেস্তোরাঁ ইত্যাদি।

আমরা প্রথমে টিকিট কাউন্টারে গেলাম এবং পাসপোর্ট দেখায়ে আমাদের বুলেট ট্রেনের টিকিট সংগ্রহ করলাম। তারপর ডিজিটাল বোর্ড থেকে প্লাটফর্ম নাম্বার জেনে নিয়ে গেটের সামনে লাইন করে দাঁড়ালাম। চীনারা খুব সুশৃংখল জাতি, তাদের লাইনে দাঁড়ানো কথা বলে দিতে হয় না। এক জনের পর এক জন এমনিতেই লাইন করে দাঁড়িয়ে যায়। আমাদের ট্রেনের সময় ৭.২৫ মিনিটে। ঠিক ৭.১৫ মিনিটে গেট খুলে দেয়া হল। টিকিট স্ক্যান করে আমরা সবাই ভিতরে ঢুকে গেলাম। প্রতিটা বগির নাম্বার আছে। আমরা নাম্বার মিলিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম। প্রথমে সিট খুঁজে বসে পড়লাম। তারপর চারপাশটা দেখতে শুরু করলাম। ৭.৩০ আমাদের ট্রেন চলা শুরু করল। আমার পাশে বসেছিল ছিল রিয়ন। ঐ ট্রেনে উঠে প্রথমে খুঁজে বের করল মনিটর কোথায়, যাতে ও স্পিড কত উঠছে সেটা দেখতে পাবে। আমরা ভেবেছিলাম, বুলেট ট্রেনটি যখন ৩২০ কিমি বেগ পার ঘন্টা চলবে আমরা হয়ত ভর শুন্য বা কিছু একটা অনুভব করব কিন্তু না এমন কিছুই হল না। আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমরা নিজেরা ট্রেনের ভিতরেই অবস্থান করছি এবং ট্রেনের বেগ এবং আমাদের বেগ সমান। তাই ট্রেনের ভিতর থেকে বেগ বোঝা সম্ভব নয়। সত্যি বলতে কি আমি আসলে বুলেট ট্রেন আর রোলার কোস্টারকে একই ছকে বেঁধে ফেলেছিলাম।

আস্তে আস্তে ট্রেন চলা শুরু করল। আমরা জানালা দিয়ে বাহিরের দৃশ্য দেখা শুরু করলাম। বাইরে থেকে দেখা যায় যে, বুলেট ট্রেন আমাদের সামনে দিয়ে এক পলকে চলে যায় তেমন কিছুই অনুভব হল না। তখন বিমানের কথা মনে হল আর হাসি পেল আসলে কল্পনা থেকে বাস্তবতা অনেক আলাদা। স্ক্রিনে দেখতে লাগলাম স্পিড আস্তে আস্তে বাড়ছে। রিয়ন রূপক আর উদয় এক দৃষ্টি তাকিয়ে ছিল স্ক্রিনের দিকে। যখন স্পিড ২৮০ তে উঠল তখন পাশ থেকে রিয়ন বলল আপু কান একটু বন্ধ বন্ধ লাগছে কি? আমি বললাম হ্যাঁ লাগছে। একটা জায়গাতে ট্রেন নদীর ভিতর দিয়ে যায়। টানেলে ঢুকার মুখে মনে হল ট্রেন সামান্য উপর দিকে উঠে আবার নিচে নেমে গেল। পুরা ট্রেন যাত্রাটা ছিল এক মজার অভিজ্ঞতা। ট্রেন নিয়ে কথা বার্তা শেষ না হতে ঘোষনা শুরু হয়ে গেলে আর কিছু ক্ষনের মাঝেই আমরা শেনজেন স্টেশনে পৌঁছে যাব। মাত্র ৩০ মিনিটের মাঝে আমরা পৌঁছে গেলাম শেনজেনের ফুতিয়ান স্টেশনে। সেখানে থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড সাবওয়ে মানে মেট্রো রেলের টিকিট কাটলাম লাইন দুই এর উইন্ডো অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড স্টেশনের। এই মেট্রো স্টেশনের গেইটের ডিজাইন করা হয়েছে চাইনিজ-আমেরিকান স্থপতি মিং ফেই এর ডিজাইন করা ল্যুভর মিউজিয়ামের প্রধান প্রবেশদ্বার মত গ্লাস পিরামিড আদলে। এক্সিট J দিয়ে বের হয়ে সর্বপ্রথম দর্শনার্থীদের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি আকর্ষন করে তা হল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা আইফেল টাওয়ার, যেন হাতছানি দিয়ে পথচারীদের আমান্ত্রণ জানাচ্ছে।

আমরা সোজা টিকিট কাউন্টারে গেলাম। প্রবেশ টিকিটের দাম ২২০ ইউয়ান, যা বয়স্ক এবং শিশুদের জন্য ১১০ ইউয়ান। তবে সন্ধ্যা ৬ থেকে ৮ টা পর্যন্ত ইভিনিং টিকিট ১০০ ইউয়ান। টিকিট কেটে সবার প্রথমে পেট পূজার কথা মনে হল সবার। যদিও

আশেপাশে কোন হালাল রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ল না। দেখলাম একটা দোকানে সবজি রোল তৈরি করছে। কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করলাম যে সেখানে কি কেবল ভেজ-ফুড পাওয়া যায় কিনা? বেশ সকাল ছিল আর দোকানে ভিড় কম ছিল, তাই দোকানী আমাদের খুব সুন্দর করে বুঝালো তার দোকানে কোন মাংস পাওয়া যায় না। কেবল সবজি আর ফল দিয়ে তৈরি খাবার পাওয়া যায়। তারপর আমরা খেয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। উইন্ডো অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড এর ভিতরে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ল বিশাল মঞ্চ।

জাতীয় দিবসের প্রথম দিন ছিল, তাই বিভিন্ন আয়োজন চলছিল। সম্পূর্ন পার্কটিকে ৮ টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এশিয়া, ইউরোপ, ওশেনিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকার ইত্যাদি। আমরা আস্তে আস্তে একটি অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চল দেখা শুরু করলাম। এই থিম পার্কে চায়না গেট, জাপান গার্ডেন, মাউন্টেন ফুজির টপ স্পীড, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান ওয়াটারসাইড ভিলেজ, মাওরি ডেভেলিংস, ভেনিস দ্য সিটি অফ ওয়াটার, ক্রস ইউরোপ, আফ্রিকান লোক বাসস্থান, মিশরের পিরামিড, পিসার হেলানো টাওয়ার, নায়াগ্রা জলপ্রপাত, আমাজন জঙ্গল স্লাইড-ফ্লাই ওভার আমেরিকা-ভারতীয় বাসস্থান, আল্পসের হিমায়িত ওয়ার্ল্ড, আয়রন টাওয়ার, ট্রায়াম্ফল আর্চ, গ্লোবাল এরিনা এক্সট্রাভাগানজা, প্যারিসের আইফেল টাওয়ার এবং আরও কিছু সহ সমগ্র বিশ্বের ১৩০ টি প্রধান ল্যান্ডমার্কের প্রতিরূপ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন রকম রাইড এবং গেমস, যার জন্য আলাদা করে টিকিট কাটতে হয়। প্রতিটি জোনে আবার রয়েছে সেই দেশীয় খাবার রেস্তোরাঁ এবং পোষাক ও সাজের জিনিস। যেমন, কেউ চাইলে তাজমহলের সাথে ইন্ডিয়ান সাজে সেজে ছবি তুলতে পারে আবার থাই ভিলেজে বসে থাই ফুড খেতে পারে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরের রাস্তায় বসে উপভোগ করতে পারে চা কফি কেক বা হালকা খাবার। সম্পূর্ণ পার্কটি ঘুরতে আমাদের প্রায় ছয় ঘন্টা সময় লাগে গেল। যেহেতু সেটা আমাদের প্রথম শেনজেন ভ্রমণ ছিল তাই আমাদের ইচ্ছা ছিল সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার। কিন্তু সেখানে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছিল যা দেখার জন্য পাস দরকার যা আমাদের কাছে ছিল না তাই আমরা আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সি-ওয়ার্ল্ড এ গেলাম। যা শেনজেনের একটি মুল আকর্ষণ। সি-ওয়ার্ল্ড সর্ব সাধারনের জন্য উন্মুক্ত একটা জায়গা। সমুদ্রের ধার ঘেষে সমুদ্র সৈকত গড়ে উঠা এই পার্ক থেকে দেখা যায় শত শত জাহাজ, ছোট নৌকা, হংকং এর সীমানাও দেখা যায়। আমরা সেখানে বসে সূর্যাস্ত দেখলাম তারপর সন্ধ্যার ফাউন্টেন শো দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। সি-ওয়াল্ডের ফাউন্টেন শেনজেনের সবচেয়ে বড় ফাউন্টেন। কিন্তু দূরভাগ্যবশত আমাদের তা দেখা হল না, কারণ আমাদের ফিরতি ট্রেনের সময় হয়ে এসেছিল।

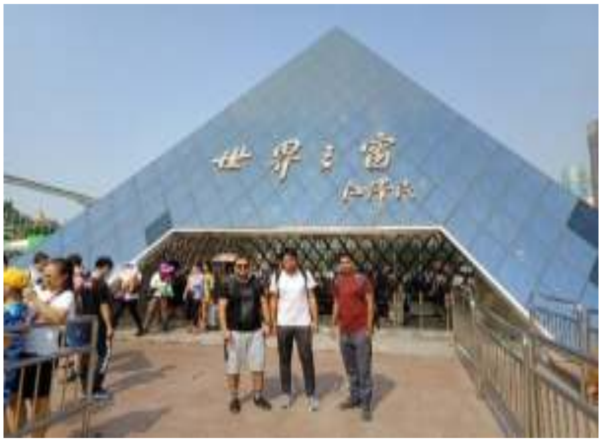

আমরা রাত ৯.৩০ টায় ক্যাম্পাসে ফিরে এলাম। সত্যি অসাধারণ একটা দিন ছিল এটি। কখন ও সত্যিকারের আইফেল টওয়ার বা পিরামিড বা নায়াগ্রা জলপ্রপাত বা তজমহল দেখার সৌভাগ্য হবে কিনা জানি না। আমার কাছে কেবল একটা জিনিস মনে হয়েছে, উইন্ডো অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড এর প্রতিরূপ গুলোই যদি এত সুন্দর হয় তবে সত্যিকারের সেই সব জিনিস বা স্থাপনা গুলো না জানি কত সুন্দর। এ ভ্রমণ যেন আমার ভ্রমণ পিপাসাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

লেখিকা :
পিএইচডি শিক্ষার্থী, ফুড সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
সাউথ চীন ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, গুয়াংজু, চীন।

শিল্পকর্ম

Title: Shilpacharya Zainul Abedin
Medium: Tempera on Handmade paper
Size: 16x12 Inches
Year: 2020

Artist Name: Sushanta Kumar Adhikary (PhD)
Professor, Department of Oriental Art
Faculty of Fine Art, University of Dhaka, Bangladesh

Title: Multiple Head
Medium: Ceramics (Freehand Ceramics Sculpture)
Size: 30"×36"

Artist Name: Dr. Abdul Matin Talukder
Professor, Department of Ceramics & Sculpture,
University of Rajshahi, Bangladesh

শিল্পকর্ম

Title: Inside the round, (relief sculpture)
Medium: bronze
Size: 64×64×4cm.

Artist Name: Mukul Kumar Barai
Associate Professor, Department of Sculpture
University of Dhaka, Bangladesh

Title: Portrait
Media: Water color on paper
Size: 19x13 inch

Artist Name: Rashed Sukhon
Associate Professor,
Head of the Department, Deptartment of Fine Arts
Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University

শিল্পকর্ম

Title: Untitled
Media: Oil colour
Size: 57×57 c.m.
Year: 2012

Artist Name: Dr. Siddhartha Talukder
Professor, Department of Painting,
Oriental Art & Printmaking
University of Rajshahi, Bangladesh

Title: Motion-01
Media: Acrylic on Canvas
Size: 120cm X75cm
Year: 2019

Artist Name: Prodip saha
Lecturer, Department of Fine Arts
Rabindra Maitree University

শিল্পকর্ম

Title: Landscape with blue sky
Medium: Acrylic on Canvas
Size: 44x44 inch
Year: 2022

Artist Name: Professor Dr. Bazlur Rashid Khan
Department of fine arts,
Jagannath University, Bangladesh

Title: Reformation of Existence
Media: Digital
Size: 100cm X70cm

Artist Name: Subrata kumer
Nanjing University of the Arts, China

Title: Destruction is the main goal-1
Medium: Soft Ground Etching
Size: 12"×14"

Artist Name: Sumanta Rani Mohanta
Artist, Print Maker.
MFA Rabindra Bharati University, Kolkata.
MFA University of Chittagong.
BFA-Department ofGraphics (print making)
Institute of fine arts, University of Chittagong.

আলোকচিত্র

Fighting Milu Deer, Yancheng city, Jiangsu

Fishing crane at Chang Guangxi Wetland Park

Xuelang Scenic, Wuxi City, Jiangsu

Vai-brother at Taihu Bay

Ishtiaq Ahmed
Winner, Outstanding Potography Award,
BCYSA Community Award-2021
Master’s Student, Jiangnan University, Wuxi, Jiangsu, China

সমাপ্ত

মহাপ্রাচীর ম্যাগাজিন সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে অথবা পরবর্তী সংখ্যায় (মহাপ্রাচীর অষ্টম সংখ্যা-ডিসেম্বর ২০২২) এ লেখা পাঠাতে ইমেইল করুন :

mahaprachir@outlook.com

পূর্ববর্তী ম্যাগাজিনের সংখ্যাগুলো পেতে ভিজিত করুন : https ://www.bcysa.org/magazines

চীনে শিক্ষা, স্কলারশিপ, বাণিজ্য এবং চীন ও বাংলাদেশ সম্পর্কে আপডেট পেতে ভিজিত করুন :-

ফেইসবুক পেইজ : www.facebook.com/bcysaofficial

ফেইসবুক গ্রুপ : www.facebook.com/group/bcysa.cn

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : www.bcysa.org